Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

হিন্দুইজম (দেববেদীর অসামঞ্জস্যতা)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা: হাবিবা খাতুন

রোলঃ ২১৫০০৪৬১

৭ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

হিন্দুইজম (দেবদেবীর অসামঞ্জস্যতা)

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা: হাবিবা খাতুন

রোলঃ ২১৫০০৪৬১

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "হিন্দুইজম (দেবদেবীর অসামঞ্জস্যতা)" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোছা: হাবিবা খাতুন, আইডিঃ ২১৫০০৪৬১ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " হিন্দুইজম (দেবদেবীর অসামঞ্জস্যতা) " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

মোছা: হাবিবা খাতুন

আইডিঃ ২১৫০০৪৬১

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৭ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
ভূমিকা	৬-৭
প্রথম অধ্যায়	৮-২১
দাওয়াতী কাজের গুরুত্ব	৮-১১
কেন আমরা অমুসলিম কে দাওয়াত দিব	১১-১৫
অমুসলিমদের কে দাওয়াত -শরয়ী বিধান	১৬-২১
দ্বিতীয় অধ্যায়	২২-৫১
দেবদেবী কি?	২২-২৩
দেবদেবীর পরিচয়	২৩-২৬
ভগবান ও দেবতাদের মধ্যে আত্মীয়ের সম্পর্ক	২৬-২৭
দেবতাদের শ্রেণিবিভাগ	২৭-৩০
দেবদেবীর সংখ্যা	৩০
দেবতা ও অসুরের অসামঞ্জস্যতা	৩১-৩২
অসুর জাতির কিছু ইতিকথা	৩২-৪৩
দেবদেবীর ক্ষমতা	৪৩-৪৪
আঞ্চলিক দেবতা	৪৪
দেবদেবীর দৈহিক বৈচিত্র্য	৪৪-৪৫
দেবদেবীর অবস্থান	৪৫
রাগের দেবতা	৪৫
প্রেমের দেবতা	৪৬
বিপদকালীন দেবতা	৪৬
অস্ত্রধারী দেবতা	৪৬-৪৭
দেবতাদের বাহন	৪৭
দেবতাদের বাহন পূজা	৪৭
শক্তিপূজা	৪৭-৪৮
সনাতন ধর্মে দুই সমকামী দেবতা	৪৮-৫১
কার্তিকের আশ্চর্য ও চমকপ্রদ জন্ম	৫১

বিষয়বস্তু	**পৃষ্ঠা সংখ্যা**
তৃতীয় অধ্যায়	৫২-৫৮
অনেকে দেবতাদের ফেরেশতা বলে থাকেন এটা বলা কতটুকু সমীচীন?	৫২-৫৪
দেবদেবীর কিছু অসারতার পর্যালোচনা	৫৫-৫৭
চতুর্থ অধ্যায়	৫৮-৬৮
সাধারণ কিছু প্রশ্ন- উত্তর পর্ব	৫৯-৬২
হিন্দুভাইদের সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে দাওয়াত দেয়ার পদ্ধতি	৬৩-৬৮
রেফারেন্স	৬৯-৭১

ভূমিকা:

সমস্ত প্রশংসা আমাদের রব মহান রব্বুল আলামীন আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, যিনি সমস্ত সৃষ্টির একক ও অদ্বিতীয় স্রষ্টা, যিনি ছাড়া কোনো হক্ক ইলাহ নেই, যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, সবাই উনারই মুখাপেক্ষী, যিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং কেউ উনাকে জন্ম দেন নি, যার সমতুল্য কেউ নেই এবং যিনি কিনা সমস্ত মানবজাতি ও জ্বীন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র উনারই ইবাদাত করার জন্য। এরপরেই দরুদ ও সালাম পেশ করছি আমাদের পেয়ারা নবীজি মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর যিনি শুধু শেষ নবী ই ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন সমগ্র বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত যাকে আল্লহ রব্বুল আলামীন প্রেরণ করেছিলেন শেষ জামানার সকল উম্মাহর হেদায়েতের নূর হিসেবে এবং যার মেহনতের ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। পরিপূর্ণ রহমত বর্ষিত হোক সাহাবায়ে কেরাম ও আজ পর্যন্ত ইসলামের প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন উৎসর্গ ও ত্যাগ স্বীকারকারী মহামনীষীদের প্রতি।

উম্মাহর এই ক্রান্তিলগ্নে ব্যথিত অন্তর যখন উম্মাহর পেরেশানি তে আচ্ছন্ন ঠিক তখনি একজন মু'মিন বান্দা বসে থাকতে পারেনা যেখানে বিধর্মী দেশগুলো মানুষের ঈমান নিয়ে খেলা করছে, যেখানে কথিত তেত্রিশ কোটি দেবতার দেশ ভারত থেকে শুরু করে সমস্ত বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ইহুদি রাষ্ট্র গুলো বসে নেই, এক হয়ে মুসলিম উম্মাহর ঈমান ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সেখানে আমাদের কি চুপ থেকে বসে থাকা উচিত?

এরই নিমিত্তে আমরা এই ছোট্ট বইখানা লিখার চেষ্টাটুকু করেছি, যদি কোনো অমুসলিম ভাই অথবা বোন বইটি পড়ে একজন ও ঈমানের আলোয় জ্বলে উঠতে পারে, অন্তরের গভীরতম কোণ থেকে কিছু ক্ষীণ আশা নিয়ে আমরা এই

বইয়ে হিন্দুইজমের "দেবতাদের অসামঞ্জস্যতা" নিয়ে আলোচনা করেছি যেন হিন্দভাইদের দাওয়াত পাওয়া আর একটু সহজ হয়। আলোচনার সাথে সাথে প্রমাণ হিসেবে তাদের হিন্দু পন্ডিতের লেখা বই থেকে কিছু তথ্য দেয়ার ও চেষ্টা করা হয়েছে। মানুষ হিসেবে আমাদের ভুল থাকতে পারে তাই ভুল গুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল এবং সেই সাথে পরিশেষে আল্লাহপাকের কাছে দু'আ করছি যেন তিনি আমাদের দ্বারা উনার দিকে আল্লাহর বান্দাদের ডাকার তৌফিক দান করেন। আমীন।

প্রথম অধ্যায়

দাওয়াতী কাজের গুরুত্ব

তাওহীদ ও রিসালাতের বিশুদ্ধ ঈমান অর্জন ও সর্ব প্রকার শির্ক, কুফর ও নিফাক থেকে আত্মরক্ষা সকল নবীরই দা'ওয়াতের বিষয় ছিল প্রথমত: এটি। কুরআন-হাদিসে এ বিষয়ের দা'ওয়াতই সবচেয়ে বেশি দেওয়া হয়েছে। একদিকে যেমন তাওহীদের বিধানাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার দা'ওয়াত দেওয়া হয়েছে, তেমনি বারংবার শির্ক, কুফর ও নিফাকের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

নবী রাসূলগণের মূল দায়িত্ব:

সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ, প্রচার, নসীহত, ওয়াজ বা এককথায় আল্লাহর দীন পালনের পথে আহ্বান করাই ছিল সকল নবী ও রাসূলের (আলাইহিমুস সালাম) দায়িত্ব। সকল নবীই তাঁর উম্মতকে তাওহীদ ও ইবাদতের আদেশ করেছেন এবং শির্ক, কুফর ও পাপকাজ থেকে নিষেধ করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلۡأُمِّيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُۥ مَكۡتُوبًا عِندَهُمۡ فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَٱلۡإِنجِيلِ يَأۡمُرُهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَىٰهُمۡ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ﴾ [الاعراف: ١٥٧]

"যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মি নবীর, যাঁর উল্লেখ তারা তাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জীলে লিপিবদ্ধ পায়, যিনি তাদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দেন এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করেন।" [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৫৭]

এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্মকে আদেশ ও নিষেধ নামে অভিহিত করা হয়েছে। অন্যত্র এ কর্মকে দা'ওয়াত বা আহ্বান নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا لَكُمۡ لَا تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدۡعُوكُمۡ لِتُؤۡمِنُواْ بِرَبِّكُمۡ﴾ [الحديد: ٨]

“তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আন না, অথচ রাসূল তোমাদেরকে আহ্বান করছেন যে, তোমরা তোমাদের রবের ওপর ঈমান আন।” [সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ৮]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ দায়িত্বকে দা‘ওয়াত বা আহ্বান বলে অভিহিত করে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥]

“আপনি আপনার রবে দিকে আহ্বান করুন হিকমত বা প্রজ্ঞা দ্বারা এবং সুন্দর ওয়াজ-উপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে উৎকৃষ্টতর পদ্ধতিতে আলোচনা-বিতর্ক করুন।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১২৫]

অন্যত্র এই দায়িত্বকেই তাবলীগ বা প্রচার বলে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَۖ وَإِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهُۥ﴾ [المائدة: ٦٧]

“হে রাসূল! আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা আপনি প্রচার করুন। যদি আপনি তা না করেন তাহলে আপনি আল্লাহর বার্তা প্রচার করলেন না।” [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৬৭]

কুরআনুল কারীমে বারবার বলা হয়েছে যে, প্রচার বা পোঁছানোই রাসূলগণের একমাত্র দায়িত্ব। নিচের আয়াতে বলা হয়েছে:

﴿فَهَلۡ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلۡبَلَٰغُ ٱلۡمُبِينُ﴾ [النحل: ٣٥]

“রাসূলগণের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টভাবে প্রচার করা।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৩৫]

নূহ আলাইহিস সালামের জবানিতে বলা হয়েছে:

﴿أُبَلِّغُكُمۡ رِسَٰلَٰتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمۡ﴾ [الاعراف: ٦٢]

“আমি আমার রবের রিসালাতের দায়িত্ব তোমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি এবং আমি তোমাদের নসীহত করছি।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৬২]

সূরা আল-আ‘রাফের ৬৮, ৭৯, ৯৩ নম্বর আয়াত, সূরা হুদ-এর ৩৪ নম্বর আয়াত ও অন্যান্য স্থানে দা‘ওয়াতকে নসীহত বলে অভিহিত করা হয়েছে

সূরা আশ-শুরার ১৩ আয়াতে বলেছেন:

﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحٗا وَٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهِۦٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓۖ أَنۡ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِۚ كَبُرَ عَلَى ٱلۡمُشۡرِكِينَ مَا تَدۡعُوهُمۡ إِلَيۡهِۚ﴾ [الشورا: ١٣]

“তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে- আর যা আমি ওহী করেছি আপনাকে- এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা এবং ঈসাকে, এ বলে যে, তোমরা দীন প্রতিষ্ঠা কর এবং তাতে দলাদলি-বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করো না। আপনি মুশরিকদের যার প্রতি আহ্বান করছেন তা তাদের নিকট দুর্বহ মনে হয়।” [সূরা আশ-শুরা, আয়াত: ১৩]

উম্মতে মুহাম্মাদির অন্যতম দায়িত্ব ও বৈশিষ্ট্য:

দা‘ওয়াত, আদেশ-নিষেধ, দীন প্রতিষ্ঠা বা নসীহতের এই দায়িত্বই উম্মতে মুহাম্মাদির অন্যতম দায়িত্ব ও বৈশিষ্ট্য।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٠٤﴾ [ال عمران: ١٠٤]

“আর যেন তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০৪]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

﴿كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَتُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِۗ وَلَوۡ ءَامَنَ أَهۡلُ ٱلۡكِتَٰبِ لَكَانَ خَيۡرٗا لَّهُمۚ مِّنۡهُمُ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَأَكۡثَرُهُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ١١٠﴾ [ال عمران: ١١٠]

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, মানবজাতির (কল্যাণের) জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা ন্যায়কার্যে আদেশ এবং অন্যায় কাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহতে বিশ্বাস কর।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১১০]

প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন,

﴿يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُسَٰرِعُونَ فِي ٱلۡخَيۡرَٰتِۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ١١٤﴾ [ال عمران: ١١٤]

"তারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে এবং তারা ভালো কাজের আদেশ দেয় ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। আর তারা কল্যাণকর কাজে দ্রুত ধাবিত হয় এবং তারা নেককারদের অন্তর্ভুক্ত।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১১৪)

কেন আমরা অমুসলিম কে দাওয়াত দিব?

মুসলিম জাতি আজ লাঞ্ছিত, অপমানিত ও পদদলিত। বর্তমানে তারা নানা সমস্যায় জর্জরিত। যদি এসব সমস্যা নিয়ে আমরা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করি, তাহলে আমাদের সামনে একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, দাওয়াতের কাজ ছেড়ে দেয়ার কারণেই মুসলমানদের এই দুরাবস্থা। দাওয়াতের কাজ পরিত্যাগ করাই হলো মুসলমানদের অবমাননাকর জীবনের মূল কারণ।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন- 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। মানুষের কল্যাণের জন্যই তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা সৎকর্মের আদেশ দাও এবং অসৎকর্মের নিষেধ করো। আর আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখো।' (সূরা আল-ইমরান, আয়াত : ১১০)

আয়াতটির দিকে ভালোভাবে মনোযোগ দিই। এখানে আল্লাহ তাআলা একথা বলেননি যে, তোমাদের কেবল মুসলমানদের কল্যাণের জন্যই পাঠানো হয়েছে। বরং বলা

হয়েছে, তোমাদের পাঠানো হয়েছে সকল মানুষের কল্যাণের জন্য। সুতরাং বোঝা গেলো, মুসলিম জাতির সৃষ্টি বিশ্বমানবতা তথা মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে সকলের কল্যাণের জন্য; শুধু মুসলমানদের কল্যাণের জন্য নয়।

উক্ত আয়াতে বিশ্বমানবতার কল্যাণ কীভাবে হবে তাও পরিস্কার করে বলে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে- 'তোমরা সৎকর্মের আদেশ দাও এবং অসৎকর্মের নিষেধ করো।' আর যেহেতু সৎকর্মের মূল হলো ঈমান আর অসৎকর্মের উৎস হলো কুফর ও শিরক, তাই কুফর ও শিরক থেকে মানুষকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে ঈমানের দাওয়াতকে ব্যাপকতর করাই হবে সবচেয়ে বড় কল্যাণকর কাজ।

মানুষকে আল্লাহ তাআলা তাঁর ইবাদত ও দাসত্বের জন্য সৃজন করেছেন। তিনি বলেছেন, "আমি মানুষ এবং জিনকে আমার ইবাদত ও দাসত্বের জন্যই সৃষ্টি করেছি"।

আর এই দাসত্ব ও ইবাদতে পূর্ণতা অর্জনের জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনকে তিনি আদর্শ ও নমুনা হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। সূরা আহযাবের ২১ নং আয়াতে তিনি বলেছেন- 'তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।'

সফল রাজনীতিবিদ তো অন্যের ভোটব্যাংক দখল করে সুযোগ মতো নিজের দলে যোগ করার ফিকিরে থাকে। এমনিভাবে যে শাসক শুধুই নিজের সীমান্ত রক্ষার প্রতি মনোযোগী হয়, সে ধীরে ধীরে তার শাসনাধীন এলাকা হাতছাড়া করে ফেলে। পক্ষান্তরে যে শাসক নিজ সীমান্ত রক্ষার পাশাপাশি তার সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে বাড়তি এলাকা দখলের জন্য সুযোগের সন্ধানে থাকে; তার সাম্রাজ্যের বিস্তার না হলেও কমপক্ষে নিজের শাসনাধীন এলাকা রক্ষা পায়। এই নীতি অনুযায়ী মুসলমান ভাইদের উপর মেহনতের পাশাপাশি অমুসলিম সমপ্রদায়কেও ইসলামের দাওয়াত দিয়ে নিজেদের সংখ্যা বাড়াতে সচেষ্ট হতে হবে।

মুসলমানদেরকে ধর্মান্তরিত হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য উপদেশ দেওয়া এবং আমলের প্রতি উৎসাহ প্রদানের গুরুত্ব কোনো অংশেই কম নয়, কিন্তু এতটুকু কাজকে জীবনের আসল উদ্দেশ্য মনে করা কখনোই যথেষ্ট হতে পারে না। বরং মুসলিম জাতির ঈমানের স্থায়িত্ব ও দীনী সচেতনতা সৃষ্টির জন্য অন্যান্য অমুসলিম জাতির মধ্যে দাওয়াতের কাজ করাও একান্ত প্রয়োজন।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী রাযি.কে সম্বোধন করে বলেছেন- 'হে আলী! তোমার দ্বারা যদি একজন লোকেরও হেদায়েত মিলে যায়, তাহলে তোমার নাজাতের জন্য তা-ই যথেষ্ট।' (বুখারী, মুসলিম)

মুহতারাম পাঠক! এই হাদীসে মাত্র একজনের হেদায়েত লাভকে মুক্তির জন্য যথেষ্ট বলা হয়েছে। সুতরাং ভেবেচিনতে বলুন তো, এত বড় মোবারক কাজ- যার দ্বারা শত শত হাজার হাজার মানুষের হেদায়েত লাভের সম্ভাবনা রয়েছে তা থেকে কোন জিনিস আমাদেরকে দূরে সরিয়ে রেখেছে?

দাওয়াত আল্লাহর তাআলার নিকট অতি গ্রহণযোগ্য একটি আমল। এই আমলকে তিনি অত্যন্ত পছন্দ করেন। এজন্যেই তো উপরের হাদীসে দাওয়াতের মাধ্যমে কারো ঈমান আনার ফলে দাঈ'র নাজাতের ওয়াদা করা হয়েছে।

মুফাককিরে ইসলাম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কালীম সিদ্দিকী দামাত বারাকাতুহুম

তার 'আরমোগানে দাওয়াত' নামক গ্রন্থে' এ সংক্রান্ত একটি চমৎকার ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন-

'ফুলাতের এক লোক। নাম জানা হয়নি। আমরা তাকে মামা বলে ডাকতাম। গায়ের রঙ কুচকুচে কালো। গ্রামে গ্রামে ঘুরে তেল বিক্রি করতো সে। তার নেশা করার বদভ্যাস ছিলো। নিয়মিত স্প্রিট সেবন করতো। এতে তার ফুসফুস নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো।

একবার রমজান মাসে শেষ জুমআর পূর্বে সে গোসল করে এবং ভোর রাতে সেহরী খেয়ে রোযা রাখার নিয়ত করলো। নামাযও আদায় করলো। তার প্রচণ্ড কাশি উঠলো। এরপর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দুনিয়া থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করলো।

জুমআর নামাযের পর পবিত্র রমযান মাসে তার জানাযা হলো। আশ্চর্যের বিষয় হলো, তার জানাযায় এতো লোকের সমাগম হয়েছিলো যে, সাধারণত আমাদের এলাকায় এমনটি দেখা যায় না। ঘটনাক্রমে আমি তার জানাযায় ইমামতি করলাম। নামাযের পর ভাবলাম, এই পবিত্র রমযান মাসে লোকটি মারা গেলো; বড়ই মোবারক তার মৃত্যু! মুখখানি একনযর দেখার জন্য কাফন সরালাম। দেখলাম, এই কালো লোকটির চেহারা আজ কতো সুন্দর! কতো মায়াময়!! যেনো চেহারা থেকে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে!!! এই দৃশ্য দেখে আমি অবাক হলাম। মনে মনে বলতে লাগলাম, হে আল্লাহ! এই লোকটির কোন আমল আপনার কাছে এত প্রিয় হলো যে, আপনি তাকে এমন মোবারক মৃত্যু দিলেন, তার চেহারাকে এমন উজ্জ্বল করলেন! খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারলাম- বেচারা এক মুচি সমপ্রদায়ের হিন্দু মেয়েকে দাওয়াত দিয়ে মুসলমান বানিয়ে বিয়ে করেছিলো। মেয়েটি দীর্ঘদিন জীবিত ছিলো। বড়ই নামাযী ও দীনদার ছিলো। এসব শুনে আমার বুঝে এসে গেলো যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী রা.কে ডেকে যা বলেছিলেন এটা তার বাস্তব প্রতিচ্ছবি। দেখুন, একজন হিন্দু মেয়েকে মুসলমান করায় এই লোকটির কী ঈর্ষণীয় মৃত্যু হলো!!!’

দাওয়াতের কাছে আগ্রহী কিছু ভাই মনে করেন- ‘আজ ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য প্রতিকূল পরিবেশ বিরাজ করছে। সুতরাং বর্তমানে যেখানে মুসলমান হওয়াই একটি অমার্জনীয় অপরাধ, বিশ্বের তাবৎ শক্তি যেখানে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধংদেহী, সেখানে অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দেয়া একটি কল্পনা বৈ কিছু নয়।’ আসলে এটি ভুল ধারণা ও শয়তানী চক্রান্ত।

প্রিয় ভাই-বোনেরা! যদিও একথা সত্য যে, বর্তমান সময়টি ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য প্রতিকূল, কিন্তু মনে রাখতে হবে, রাত যত গভীর হয় প্রভাত তত নিকটবর্তী

হয়। ইসলামের শান এই যে, চরম প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও দাওয়াতের ক্ষেত্রে উর্বরই হয়ে থাকে। ইতিহাস এমনটাই সাক্ষ্য দেয়।

আসলে প্রতিকূল পরিবেশেই ইসলাম ও ঈমানের চাষ করার জন্য জমি অত্যাধিক উর্বর থাকে। সুতরাং এখন প্রয়োজন বীজ বপনের। মাওলানা কালিম সিদ্দীকি সাহেব যার হাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ মুসলমান হয়েছে, তিনি দৃঢ়তার সাথে জোর দিয়ে বলেছেন- 'বর্তমান সময়ে ঈমান ও ইসলামের দাওয়াতের জন্য এমনই পরিবেশ বিরাজ করছে যে, কেউ যদি এই বিষয়ে চেষ্টা করে তবে তার দ্বারা যে কতো লোকের হেদায়েতের ফয়সালা হবে তা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজের ভাষণে বলেছেন- শুনে রেখো, উপস্থিতিরা অনুপস্থিতিদের কাছে (দীনের দাওয়াত) পৌঁছে দেবে।

প্রিয় পাঠক! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই নির্দেশসূচক বাক্য দ্বারা তো দীনের দাওয়াত দেয়া ফরজ হওয়া বোঝায়। এজন্যেই তো হযরত সাহাবায়ে কেরাম এই নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য পৃথিবীর কোণায় কোণায় ছুটে গিয়েছিলেন। গোটা পৃথিবীকে তারা দাওয়াতের লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছিলেন। সুতরাং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ভালোবাসা পোষণকারী উম্মতের জন্য কী এটা শোভা পায় যে, তারা এই মোবারক নির্দেশ পালনে উদাসীন থাকবে?

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে বিষয়টির গুরুত্ব ভালভাবে অনুধাবন করে দাওয়াতের উর্বর জমীনে ঝাঁপিয়ে পড়ার তাওফীক দান করুন। আমিন।

অমুসলিমদের দাওয়াত -শরয়ী বিধান

এপর্যায়ে আমরা আলোচনা করবো অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দেয়ার শরয়ী বিধান কি? ফরজে আইন, ফরজে কেফায়া, না সুন্নাত। নিচের আলোচনা থেকে আশা করি বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

ফরজে আইন

অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াতী কাজ ঐ সময় ফরজ হবে যখন কুফর বিজয়ী থাকবে, সত্য পরাজিত থাকবে, দা'ঈর সংখ্যা হবে নিতান্তই কম, মন্দকাজ হবে ব্যাপক, মুর্খতা ও অজ্ঞতা সর্বস্তরে বিরাজ করবে। এমতাবস্থায় ব্যক্তিগতভাবে সাধ্যানুযায়ী অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াত ফরজে আইন।

সুন্নাত

অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াতী কাজ ঐ সময় সুন্নাত হবে, যখন দা'ঈদের সংখ্যা থাকবে পর্যাপ্ত। দাওয়াতী সংঘঠন চতুরদিকে ছড়িয়ে পরবে। হক বিজয়ী থাকবে। বাতিল থাকবে পরাজিত। রাষ্ট্র নিজেই দাওয়াতী কাজ আঞ্জাম দিবে। এই অবস্থায় সাধরণ মানুষের উপর দাওয়াতী কাজ করা সুন্নাত।

ফরজে কেফায়া

ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, অমুসলিম ভাই-বোনদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া ফরজে কেফায়া। অনেকে বলেছেন সাধ্যানুযায়ী ফরজে আইন। আমরা ফরজে কেফায়াই ধরে নিলাম। এবার আমাদের জানতে হবে ফরজে কেফায়া কাকে বলে?ফরজে কেফায়া বলা হয় এমন হুকুম বা কাজ, যা সকল মুসলমানের উপর ফরজ। তবে সকলের পক্ষ থেকে যদি কিছু মানুষ ওই কাজ আদায় করে দেয়, তাহলে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে না। যদি আদায় না করো তাহলে সকলেই গুনাহগার হবে।

সাধারণত ফরজে কেফায়া বলতে আমরা জানাজার নামাযকে বুঝি। কাফন দাফনসহ জানাজার নামায সম্পূর্ণ করতে হলে কমপক্ষে চারজন লোকের প্রয়োজন। একজন ইমাম হলে, বাকি তিনজন মুক্তাদি। দাফনের জন্য কবরের উপরে থাকবে দু'জন। আর লাশটি কবরে নামানোর জন্য কবরে থাকবে দু'জন। মোট কথা, কাফন-দাফন সম্পন্ন হতে হলে মোট চারজন লোকের প্রয়োজন। তাহলে ফরজে কেফায়া আদায় হবে। যদি ফরযে কেফায়া আদায় না হয়, তাহলে ওই মহল্লার সকলেই গুনাহগার হবে এবং সমাপ্ত করার দায়িত্ব পড়বে পার্শ্ববর্তী সকল মুসলমানের উপর। যদি তারাও আদায় না করে, তাহলে পর্যায়ক্রমে সকল মুসলমান গুনাহগার হবে। তদ্রুপ অমুসলিমদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো হলো ফরজে কেফায়া। প্রত্যেক অমুসলিমের কাছে দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য এমন কিছু লোক থাকতে হবে। যাদের মাধ্যমে তাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছে যায়। যদি সকলের কাছে দাওয়াত না পৌঁছে, তাহলে সকল মুসলমান গুনাহগার হবে।

জানাজার নামাযের সাথে মিলালে বোঝা যায়, প্রত্যেক এলাকায় কমপক্ষে চার জন ব্যক্তি এমন থাকতে হবে, যারা সর্বদায় অমুসলিমদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিবে। যদিও চারজন দ্বারা দাওয়াতের ফরজে কেফায়া আদায় হবে না।প্রিয় পাঠক! এবার আপনার কাছে আমার প্রশ্ন, আপনি বলুন তো দেখি! আপনার এলাকায় (আপনি যে অঞ্চলেরই হোন না কেন।) এমন চারজন ব্যক্তি আছে, যারা সর্বদা অমুসলিমদের দাওয়াত দিচ্ছেন ? যদি এলাকায় না থাকে তাহলে আপনার পুরো জেলায় এমন চারজন মানুষ আছে কি, যারা সর্বদা সকল মুসলমানদের পক্ষ থেকে অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দিচ্ছেন ? যদি উত্তর 'না' হয়, তাহলে বলুন, আমরা কি ফরজে কেফায়া আদায় করছি? যদি আদায় না করে থাকি তাহলে আমরা কি গুনাহগার হচ্ছি না? অবশ্যই হচ্ছি। আর কতদিন এই ফরজে কেফায়া ছেড়ে দেয়ার গুনাহ মাথায় নিয়ে ঘুরবো? যদি কোন ব্যক্তি এককভাবে দাওয়াত দেয়ার চেষ্টা করতে থাকে, তাহলে উক্ত ব্যক্তি নিজে গুনাহ থেকে বেঁচে যাবে। কিন্তু সমষ্টিগতভাবে সকলেই গুনাহগার হবে।

জিম্মাদারী আদায়ের পদ্ধতি

দাওয়াতী কাজ যেহেতু আমাদের উপর ফরজ। এই কাজ আমাদের করতেই হবে। এখন প্রশ্ন হলো – কীভাবে করবো ? সবাই কি একসাথে দাওয়াত দিবে? সাধ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী একেক জনের কাজের ধরণও ভিন্ন হবে। বিষয়টি বুঝার সুবিধার্থে কুরআন থেকে তিনটি উদাহরণ পেশ করছি । আল্লাহ্ তা'আলা সূরা নামলের মাঝে দুইটি প্রাণীর আলোচনা করেছেন।

পিপীলিকা:

সুলাইমান – এর ঘটনায় আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, সুলাইমান যখন সৈন্যদের নিয়ে যাচ্ছিলেন, পথে এক স্থানে পিপীলিকার দল গর্ত থেকে বাইরে বের হয়ে এসেছিল। পিপীলিকার রাণী যখন বুঝতে পারলো যে তারা সুলাইমান আ. এরসৈন্য দলের পায়ের নিচে পরে পিষ্ট হয়ে যাবে। তখন রাণীপিপীলিকার দলকে ডাক দিয়ে বললো তোমরা তোমাদের গর্তে প্রবেশ কর। অন্যথায় তোমরা সুলাইমান আ. এর সৈন্যের পদদলিত হয়ে পিষ্ট হয়ে যাবে।কুরআনে করীম পিপীলিকাদের রাণীকে দা'ঈ হিসাবে পেশ করেছে। কতো ছোট একটি প্রাণী! তার অন্তরে ছোট একটি ব্যথিত হৃদয় ! তার মধ্যে নিজ জাতিকে বিপদ থেকে বাঁচানোর কতো ফিকির। সে কোন মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি নিজ জাতিকে বিপদ থেকে বাঁচানোর ফিকির করেছে।কিন্তু আমরা দেখছি আমাদের জাতি ঝাপ দিচ্ছে চিরস্থায়ী জাহান্নামের দিকে। প্রতি মুহর্তে পা ফেলছে ধ্বংসের দিকে। এব্যাপারে আমাদের কোন ফিকির নেই।

হুদহুদ পাখি:

আল্লাহ্ তা'আলা সূরা নামলে হুদহুদ পাখির ঘটনা আলোচনা করেছেন। হুদহুদ পাখি মুলকে সাবায় গেল। গিয়ে দেখল ওই দেশর রাণী বিলকিস এবং তার পুরো জাতি আল্লাহতা'লা কে ছেড়ে সূর্যের পূজা করছে। পাখি অস্থির হয়ে গেল। সে সরাসরি ওখানে লোকদের বুঝাতে পারলো না। কারণ তার ভাষা ভিন্ন, আর ওই দেশের ভাষাই ভিন্ন। পাখির ভাষা তারা বুঝতে পারতো না। সুলাইমান আ. পাখিদের ভাষা

জানতেন। তাদের কথা বুঝতেন। তাই পাখি সুলাইমান আ. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে প্রতিবেশী দেশের খবর দিলো। বলল সেখানে শিরক হচ্ছে। ফলে আপনি দ্রুত কোন পদক্ষেপ নিন। সুলাইমান আ. হুদহুদের কথা শুনে খবরটি যাচাই-বাছাই করলেন। এরপর রাণী বিলকিসের কাছে দাওয়াতী পত্র পাঠালেন। এর ফলে রাণী বিলকিস ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয় ।একটি সাধারণ পাখির প্রচেষ্টায় একটি দেশের রাণী ইসলাম কবুল করেছে। এর দ্বারা আমরা শিক্ষা অর্জন করতে পারি, আমরা যদি নিজে কোন কারণে দাওয়াতী কাজ না করতে পারি, তাহলে এমন লোককে এই কাজে নিয়োগদেব, যে এই কাজ আঞ্জাম দিতে পারবে। আমরা যদি মাদ‘উর ভাষা না বুঝি তাহলে মাদ‘উর ভাষায় ইসলামী পুস্তিকা বই এবং কুরআন ইত্যাদি প্রকাশ করে বিতরণ করতে পারি।

আমাদের দেশে খ্রিস্টানরা বিভিন্ন বই পুস্তক বিতরণ করে। যেখানে সেখানে ইঞ্জিল বিতরণ করে। এসকেটি নামে ডাক যোগে বই ও প্রচারপত্র বিতরণ করে। এই কাজের জন্য তারা নির্দিষ্ট লোক নিয়োগ দিয়েছে। তারা এর জন্য চেষ্টা মেহনত চালিয়ে যাচ্ছে। এতে সফলতাও অর্জন করছে। যা আমাদের করার ছিল তা আমরা করছি না।

বলুন তো এপর্যন্ত কয়জন অমুসলিমের কাছে আমরা কয়টি বই বা কুরআন বিতরণ করেছি? নিজেরা সরাসরি দাওয়াত না দিতে পারলে কমপক্ষে বই পুস্তক বা পত্রের মাধ্যমে খুব সহজেই দাওয়াত দিতে পারি।

আসহাবে কাহাফের কুকুর:

সূরা কাহাফে আল্লাহতা‘আলাআসহাবে কাহাফের কুকুরের দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। সেই সাত যুবক যুগের বাদশার সামনে হক্কের আওয়াজ উচু করে ছিল। ফলে পুরো রাষ্ট্র তাদের দুশমন হয়ে যায়। তারা তাদের জাতি থেকে দূরে এক স্থানে এসে একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেয়। তাদের সাথে ছিল একটি কুকুর,যা তাদের পাহারা দিচ্ছিলো।

এর দ্বারা বুঝাগেল যে, কেউ যদি নিজে দাওয়াতী কাজ না করতে পারে অন্যকে দিয়েও করাতে পারছে না তাহলে কমপক্ষে দা‘ঈ ইলাল্লাহ্র সহযোগী ও পাহারাদারী হিসাবে কাজ করবে। দা‘ঈদের প্রয়োজন মিটানোর চেষ্টা করবে।দাওয়াত ফরজ হওয়ার ব্যাপারে দলিল হিসাবে যে সকল আয়াত পেশ করা হয় তার মধ্যে কয়েকটি নিচে পেশ করা হলো-

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِ

তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِين

বলে দিন এটাই আমার পথ। আমি জেনে-বুঝে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেই এবং আমার অনুসারীরাও। আল্লাহ পবিত্র, আমি অংশীবাদীদের (শিরককারীদের) অন্তর্ভুক্ত নই।

এই আয়াতে সকল উম্মতের উপর দাওয়াতের জিম্মাদারী দেয়া হয়েছে। ইমাম গাজালী রহ. একস্থানে লিখেছেন, যদি কোন এলাকায় কোন কাফের মারা যান, তাহলে সকল মুসলিম জিজ্ঞাসিত হবে।

وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

কাফেররা যেন আপনাকে আল্লাহর আয়াত থেকে বিমুখ না করে। সেগুলো আপনার প্রতি অবতীর্ণ হওয়ার পর আপনি আপনার পালনকর্তার প্রতি দাওয়াত দিন এবং কিছুতেই মুশরিকদের দলভুক্ত হবেন না।

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

আর সমস্ত মুমিনের অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়। তাই তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হলো না, যাতে দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে এবং সংবাদ দান

করে স্বজাতিকে, যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, যেন তারা বাঁচতে পারে।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে বুঝার তাওফিক দান করুন।

কুরআন থেকে রেফারেন্স :

সুরা: নামল-৮,২০-৪০,

আলে ইমরান -১১০

ইউনুস-১০৮

কাসাস-৮৭

তাওবা-১২২

দ্বিতীয় অধ্যায়

দেবদেবী কি?

হিন্দুধর্মে দেবদেবী বলতে পরমেশ্বরের গুণ ও ক্ষমতার কোনো বিশেষ আকার বা রূপের প্রকাশ বুঝানো হয় যা হিন্দু ধর্মানুসারীদের নিকট পূজিত হয়ে থাকে। যদিও প্রত্যেক দেবতার আলাদা আলাদা জটিল চরিত্র বিদ্যমান, তথাপি অনুসারীগণ দেবতাদের এক পরম সত্তা ব্রহ্মের অংশবিশেষ হিসেবে মনে করেন। বৈচিত্রপূর্ণ এই উপাস্য বোঝাতে দেব, দেবী, ঈশ্বর, ভগবান, ভগবতী ইত্যাদি শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়।

হিন্দুদের দেব-দেবীগণ বৈদিক যুগ (খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক) ও মধ্যযুগে (খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক) নেপাল ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। হিন্দু দেবতা বলতে যোগশাস্ত্রের ইষ্টদেবতা ,তেত্রিশ বৈদিক দেবতা বা শতাধিক পৌরাণিক দেবতাদের কথা বোঝানো যায় । এদের মধ্যে মুখ্য দেবতারা হলেন বিষ্ণু, শিব, শ্রী বা লক্ষ্মী, পার্বতী বা দুর্গা, ব্রহ্মা, সরস্বতী প্রভৃতি। প্রত্যেক দেবতার আলাদা আলাদা জটিল চরিত্রাবলী বিদ্যমান হলেও তাদেরকে অনেকসময়ই "ব্রহ্ম" নামে এক নিরাকার পরম সত্তার অংশবিশেষ বলে ধরা হয়। প্রাচীন কাল থেকেই এই একত্বের ধারণা হিন্দুধর্মের অন্যতম এক বৈশিষ্ট্য, যা ধর্মশাস্ত্র এবং হরিহর (শিব ও বিষ্ণু), অর্ধনারীশ্বর(অর্ধেক শিব অর্ধেক পার্বতী) -এর মতো মূর্তিগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায়।

মুখ্য দেবতার উপাসকরা হিন্দুধর্মের ভিন্ন শাখাগুলোর জন্ম দিয়েছেন, যেমন: শৈবমত, বৈষ্ণবমত ও শাক্তমত। কিন্তু শাখাগুলোর মধ্যে বহু মিল পাওয়া যায়।

হিন্দু দেবতাদেরকে বিভিন্ন প্রতীকের দ্বারা বুঝানো হতে পারে, যেমন ছবি বা প্রতিমা। আর্য সমাজ বা ব্রাহ্ম সমাজের মতো ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্মমতগুলো একাধিক দেবতার ধারণাকে বাতিল করে নিরাকার একেশ্বর-বিশ্বাসের পথে

হেঁটেছেন। জৈনধর্ম বা বহির্ভারতীয় থাইল্যান্ড বা জাপানিজ বৌদ্ধবিশ্বাসে হিন্দু দেবতাদের আপন করে নেওয়া হয়েছে। এখনও এসব দেবতাদের সেইসব ধর্মীয় মন্দিরে বা শিল্পে দেখানো হয়।

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় শাস্ত্রে মানবশরীরকে এক মন্দির বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়ে থাকে, ভগবান মানবমন্দিরেই বসবাস করেন। একইভাবে ব্রহ্ম বা পরমতম সত্তাকে আত্মা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে এই আত্মা শাশ্বত ও চৈতন্যের কারণ।

দেবদেবীর পরিচয় :

খুব সংক্ষেপে দেবদেবীর পরিচয় তুলে ধরা হলো যেখানে ভগবান ও দেবদেবীর মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্কের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেখানো হয়েছে --

হিন্দুধর্মের আকিদা বিশ্বাসের মতে প্রভু একজন - তিনি

নিরাকার। পরে তিনি আবার সাকারে এসেছেন। তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তারপর তার ক্ষমতা ভাগ করা হয়েছে -

-সৃষ্টি করার ক্ষমতাগুণের নাম: ব্রহ্মা

-লালন করার ক্ষমতাগুণের নাম: বিষ্ণু

- ধ্বংসের দেবতা -শিব।

শিবের আরো কিছু নাম আছে :

- ভোলানাথ (অল্পতে তুষ্ট তাই ভোলানাথ)

- ত্রি নয়নি (তিনটি চোখ তাই ত্রি নয়নি)

- মহেশ্বর

- নীলকণ্ঠ

- নটোরাজ।

ভগবানের মূল ব্রহ্মা-

ঈশ্বরের একটি রুপ ব্রহ্ম। ব্রহ্মারুপে ঈশ্বর সৃষ্টি করেন। সৃষ্টি করা তার কাজ। বিশ্বের সবকিছু তিনিই সৃষ্টি করেন।

বিষ্ণু **:** হিন্দু বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ দেবতা। আদি শংকর প্রমুখ স্মার্ত পন্ডিত এর মতে, বিষ্ণু ঈশ্বরের পাঁচটি রুপের অন্যতম। আবার তৈত্তিরীয়শাখা ও ভগবতগীতা আদি শ্রুতিশাস্ত্রে তাঁকে সর্বোচ্চ ঈশ্বরের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

-বিষঞুর ৭ম নম্বরে রাম রুপে এসেছে

-বিষঞুর ৮ম নম্বরে কৃষঞ রুপে এসেছে

কৃষ্ণ : হলেন হিন্দুধর্মাঅনুসারীদের আরাধ্য বিশিষ্ট দেবতা। তিনি বিষ্ণুর অষ্টম অবতার রুপে খ্যাত। কখনো কখনো তাঁকে সর্বোচ্চ ঈশ্বর ('পরমসত্ত্বা') অভিধায়ভূষিত করা হয় এবং হিন্দুদের অন্যতম প্রধান ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদভগবদগীতার প্রবর্তক হিসাবে মান্য করা হয়।

-কৃষঞ এর প্রেমিকা রাধা। রাধা তার মামী।

-কৃষঞ বিবাহ ৮ +১৬০০১

-সন্তানঃ ১ লক্ষ ৮০ হাজার।

-বেচেছিলঃ ১২৫ বছর।

শিব: হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান দেবতা। ঈশ্বরের সৃজন, পালন, ও সংহার এই ত্রিশক্তি যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন দেবতারুপে পরিচিত। এই সৃজন -পালন-সংহার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই জগৎসংসার চলমান আছে।

শিবের স্ত্রী- পার্বতী(পর্বতকন্যা): হিমালয়ের পাদ দেশে তার বাড়ি ছিল। পার্বতী আত্মহত্যা করার পর, পরজন্মে দূর্গা হয়ে আসে।

শিব পরবর্তীতে আশ্রমে অবস্থান নেয়।

দূর্গা: যিনি দূর্গতি বা সংকট থেকে রক্ষা করেন।

দূর্গা আবির্ভাবের কারন : অসুর ব্রহ্মা থেকে বর লাভ করেছিল যে

-কোন দেবতা তাকে হত্যা করতে পারবে না।

-কোন প্রাণীকুল তাকে হত্যা করতে পারবে না।

-কোন মানুষও তাকে হত্যা করতে পারবে না।

অমৃতের বর পাওয়ার পর অসুর স্বর্গে হামলা করল দেবতাদেরকে সর্বহারা করল। ভিটেমাটি হারা হয়ে দেবতারা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হয়, ব্রহ্মা দেবতাদেরকে সাথে নিয়ে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হয়। বিষ্ণু, ব্রহ্মা, দেবতারা সবাই মিলে শিবের কাছে শরণাপন্ন হয়। শিব, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, সবাই একত্রে পরামর্শ করে যে একে আমরা একা কেউ ঠেকাতে পারবো না তাই সবার শক্তি একত্র করা হোক- দশের লাঠি একের বোঝার মতো, যে যেই বিষয়ে পারদর্শী আছো এই শক্তি একত্র কর এই শক্তির মাধ্যমে যে দেবীর সৃষ্টি হল সে হলো ভক্তির দেবী দুর্গা।

পরবর্তীতে অসুরদেরকে বধ করার উপর দূর্গার নাম পরিবর্তিত হয়- যেমন মহেশ অসুরদেরকে সে বধ করে অসুরের নামে তার নাম লাভ করে "মহেশশাসুর মর্দিনী"।

দুর্গম অসুরকে বধ করেছে এজন্য নাম হয়েছে 'দুর্গা'

এভাবে অনেক অসুরকে হত্যা করতে তাকে অনেক বেগ পেতে হয় কারণ মৃত অসুরের রক্ত মাটিতে পড়লে তা হতে নতুন অসুরের সৃষ্টি হয় তাই অসুরের রক্ত ভক্ষণ করার জন্য দুর্গা আরও একটি ভয়ংকর রূপ ধারণ করে ভয়ংকর রূপটি হলো কালী। কালির হাত চারটি, দুর্গার হাত ছিল দশটি। কালী হচ্ছে ভয়ংকর রূপ, দুর্গা ছিল শান্ত রূপ।

কালীর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য :

কালীর হাত চারটি। তার মাথায় থাকে মুন্ডমালা, অসুরদের মন্ড কেটে ৫২ টি মাথা দিয়ে মালা বানিয়ে তার মাথায় ঝুলানো আছে। জিহ্বা দাঁত দিয়ে কামড় দেয়া দেখা যায়। পায়ের নিচে শিব শুয়ে আছে তার স্বামীর বুকের উপর পা দিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে যেহেতু স্বামীর উপর পাড়া দিয়ে ফেলেছে তাই ভয়ে লজ্জায় জিহ্বা কামড় দিয়েছে, বড় অসুর কে হত্যা করতে পেরে খুশিতে পাগলের মত নৃত্য করছিল তাই স্বর্গরাজ্য কাঁপছিল, দেবতারা তাতে পেরেশান হয়ে ওঠে শিবের শরণাপন্ন হয় শিবও তাকে শান্ত করতে না পেরে কৌশল করে তার সামনে শুয়ে পড়ে সামনে শুয়ে পড়ায় স্বামীর গায়ে তার পা পড়ে।

দুর্গার দশটি হাত কেন?

দশের শক্তির প্রতীক তাই দশটি হাত। আর দশজনের অস্ত্রগুলো তার হাতে। অসুরদের সাথে যুদ্ধের জন্য তো শক্তির দেবতা পুরুষ হওয়ার কথা ছিল দেবী (নারী) হল কেন?

যেহেতু বরপ্রাপ্ত অসুর বর লাভ করেছিল এই বলে যে, কোন দেবতা, প্রাণী বা মানুষ তাকে হত্যা করতে পারবে না এই ধরনের বরের কারণে দেবীর সৃষ্টি হয় কারণ বরে এটা উল্লেখ নেই যে, কোন দেবী তাকে মারতে পারবেনা। শর্তের বহির্ভূত হল দেবী তাই পুরুষ না হয়ে নারী সৃষ্টি হল।

ভগবান ও দেবতাদের সাথে আত্মীয়ের সম্পর্ক:

-শিব এবং (কালী) দুর্গার চারজন সন্তান।

-দুই ছেলে কার্তিক (সৌন্দর্য দাতা)আর গণেশ(সিদ্ধিদাতা)

-দুই মেয়ে -লক্ষ্মী(জ্ঞানদাতা)- স্বামী বিষ্ণু,

-সরস্বতী(ধনসম্পদের দেবী) - স্বামী ব্রহ্মা।

রাজার সন্তান যেমন রাজা হয় তেমন প্রভুর সন্তান তো ভগবান প্রভু হওয়ার কথা তাহলে স্রষ্টার যদি সন্তান হয় এবং তা যদি একাধিক হয় তাহলে মূল ভগবান স্রষ্টা কে হবে তা নিয়ে তো দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হবে।

এজন্য যৌক্তিকভাবে বুঝা যায় স্রষ্টার কোন সন্তান, স্ত্রী থাকতে পারে না।

ব্রহ্মা অথবা বিষ্ণু অথবা শিব তিনজন মিলেই একজন বলা হয়ে থাকে -

তিনজন মিলে যদি একজন হয় তাহলে একজনের সন্তান মানে সবারই সন্তান একজনের স্ত্রী হলে সবারই স্ত্রী সবার বক্তব্য এবং মন-মানসিকতা একই বা অভিন্ন থাকবে। ঝগড়াঝাঁটি অথবা মারামারি অথবা হাঙ্গামা করবে না অথচ তাদের মধ্যে এই সবকিছুই হয়েছে।

পরিচয় পর্যালোচনা : আমরা এখানে দেখলাম যে একজন ভগবান বা দেবতা সৃষ্টিকর্তা, লালনকর্তা, ধ্বংসকর্তা এসব হওয়ার পাশাপাশি মানুষ হিসেবে বিবাহ করেছেন, ছেলে মেয়ে জন্ম দিয়েছেন, তাদের শ্বশুর বাড়িও ছিল, এত কিছু করে আবার প্রভুর দায়িত্ব পালন করেছিল।

এখানে কিছু প্রশ্ন থেকে গেল - শিবই যদি ধ্বংসকর্তা হয় তাহলে তিনি দুনিয়াতে আসার আগে কে ধ্বংস করতো?

শিবই যদি ধ্বংসকর্তা হন তাহলে তাকে কে ধ্বংস করলো? পক্ষান্তরে কিন্তু আমাদের আল্লহপাক সমস্ত একচ্ছত্রের মালিক, একই সাথে তিনি রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা, ধ্বংসকর্তা, তাঁর স্ত্রী,সন্তান, বিবাহের মতো দুনিয়াবি কাজের কোনো প্রয়োজন হয়নি, তিনি এসব থেকে পুরোপুরি পবিত্র ছিলেন।

দেবতাদের শ্রেণিবিভাগ

হিন্দুধর্ম গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে দেব-দেবীদের নিম্নলিখিত ভাগ করা হয়েছে--

১.বৈদিক দেবতা

২.পৌরাণিক দেবতা এবং

৩.লৌকিক দেবতা

বৈদিক দেবতা

বেদে বর্ণিত দেবতা বৈদিক দেবতা হিসেবে পরিচিত। বৈদিক যুগে বহু দেবতার উদ্দেশ্যে স্তুতি দৃষ্ট হয়। এঁদের মধ্যে তেত্রিশ দেবতাকে প্রধান হিসেবে ধরা হয়। এঁরা ১১ জন করে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোকের দেবতা।অগ্নি, বায়ু এবং ইন্দ্র-ই(সূর্য) দেবতা রূপে ভিন্ন ভিন্ন কর্মে ও বিশেষণে ত্রিলোকে ক্রিয়া করেন।

বেদে দেবের কর্ম হচ্ছে দ্যোতন অর্থাৎ সত্যোপদেশ করা। দেবের আধ্যাত্মিক অর্থ অনুযায়ী যে মানুষ সত্য মানেন, সত্য বলেন এবং সত্য উপদেশ দান করেন, তিনি দেব। দেবের বিশেষত্ব হচ্ছে দ্যুস্থান অর্থাৎ ওপরে স্থিতি লাভ। ব্রহ্মাণ্ডের ওপর স্থিতি লাভ করার জন্য সূর্যকে, সমাজের ওপর স্থিতি লাভ করার জন্য বিদ্বানকে এবং রাষ্ট্রের ওপর স্থিতি লাভ করার জন্য রাজাকে দেব বলে। বেদের দেবতা বিষয়ে নিরুক্তকার যাস্ক বলেছেন,

”দেবো দানদ্বা দীপনাদ্বাদ্যোতনাদ্বা দ্যুস্থানো ভবতীতি বা।

—ঋষি যাস্ক, নিরুক্ত ৭/১৫”

...দেবতা ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন, দেবতা তেজোময় বলিয়া পদার্থের দীপন বা দ্যোতন অর্থাৎ প্রকাশ করেন; ...‘দিবি তিষ্ঠতি’- দ্যুস্থানে বা দ্যুলোকে অবস্থিত, ইহাও বা ‘দেব’ শব্দের নির্ব্বচন হইতে পারে; ‘দিব্’ শব্দ হইতে ‘দেব’ শব্দের নিষ্পত্তি। এই শেষোক্ত নির্ব্বচনেও অগ্নির বিশেষণ হইতে কোন বাধা নাই। কারণ সামান্যতঃ সকল দেবতারই স্থান দ্যুলোক, অগ্নি এবং ইন্দ্রেরও দ্যুলোকই স্থান, তবে তাঁহাদের বিশিষ্ট কর্ম্মাধিকার স্থান পৃথিবী এবং অন্তরীক্ষ -অগ্নি পৃথিবী হইতেই হবির্বহন করেন এবং ইন্দ্রও অন্তরীক্ষে থাকিয়া বর্ষণ করেন।

—অমরেশ্বর ঠাকুর, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বৈদিক দেবমণ্ডলীতে দেব ও অসুর নামে দুটি শ্রেণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। অন্যান্য দেবতারা হলেন বিষ্ণু, রুদ্র (পরবর্তীকালে শিবের সমার্থক), প্রজাপতি (পরবর্তীতে

ব্রহ্মা) প্রভৃতি। বৈদিক দেবীর সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে ঊষা, পৃথিবী, অদিতি, সরস্বতী, সাবিত্রী, বাক, রাত্রি, অরণ্যানী ইত্যাদি ঋগ্বেদে বর্ণিত। শ্রী বা লক্ষ্মীও পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে আছেন। প্রত্যেক দেবতা এক একটি করে বিশেষ জ্ঞান বা প্রাকৃতিক শক্তির প্রকাশক। বেদ হল বিভিন্ন দেবতার স্তোত্রের একটি সংকলন। এই দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উল্লেখিত দেবতারা হলেন ইন্দ্র, অগ্নি এবং সোম। অগ্নিদেবকে সমগ্র মানবজাতির মিত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। জলদেবতা বরুণ ও বিশ্বদেব নামে এক দেবমণ্ডলীও প্রধান ছিলেন। বৈদিক যুগে দেব-দেবীর কোনো বিগ্রহ বা মূর্তি ছিল না। তবে বৈদিক মন্ত্রে এ সকল দেবতার রূপ, গুণ ও ক্ষমতার বর্ণনা রয়েছে।

পৌরাণিক যুগের দেবতা

বিভিন্ন পৌরাণিক সাহিত্যে যে-সকল দেবতার বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁদের পৌরাণিক দেবতা বলা হয়। মহাকাব্য ও মধ্যযুগীয় পুরাণসমূহে দেবতাদের সঙ্গে নানারকম রূপক উপাখ্যান ও বর্ণনা করা আছে। বৈদিক যুগে দেব উপাসনা ছিল যাগযজ্ঞ কেন্দ্রিক, হোম ও যজ্ঞের মাধ্যমে বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করে দেবতাদের আহ্বান করা হতো। তবে প্রতিমা পূজার প্রচলন হয় আরও পরে। এমন কি রামায়ন ও মহাভারত হতেও প্রতিমা পূজা প্রচলন সম্পর্কে জানা যায় না। অনুমান করা হয়, গুপ্তযুগে পুরাণ রচিত হলে এর প্রচলন শুরু হয়। এই যুগ থেকে দেবতার সাকার রূপে উপাসনা প্রচলন হয়। এই পৌরাণিক যুগে দেবতাদের বৈশিষ্টে বিবর্তন দেখা যায়। ইন্দ্র, অগ্নির প্রাধান্য হ্রাস পেয়ে অপ্রধান দেবতা যেমন বিষ্ণু, শিব প্রভৃতির প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। এ সময় দেবতার মানবায়ন হয় এবং মানবিকভাবে পূজিত হন।

পুরাণে পুরুষ দেবতার মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব হচ্ছেন প্রধান। এঁদের একত্রে বলা হয় ত্রিদেব। বেদে উল্লিখিত মন্ত্রময় বিষ্ণুকে পুরাণে দেখা যায় শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারীরূপে। এছাড়াও আছেন গণেশ, কার্তিক, যম সহ আরও বহু দেবতা। নারী দেবতার মাঝে আছেন দুর্গা বা পার্বতী, কালী, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি।

লৌকিক দেবতা

বেদে ও পুরাণে যে-সকল দেবতার কথা বলা হয় নি, কিন্তু ভক্তগণ তাঁদের পূজা করেন, তাঁদের বলা হয় লৌকিক দেবতা। যেমন- মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী, দক্ষিণ রায় প্রভৃতি । পরবর্তীকালে মনসা দেবীসহ আরও কিছু লৌকিক দেবতা পুরাণে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন ।

দেবদেবীর সংখ্যা:

হিন্দুধর্মে দেবদেবীর সংখ্যা বলা হয় ৩৩ কোটি কিন্তু কোথাও সেটা লেখা নেই আদতে লেখাও সম্ভব নয়। ঋগবেদে দুই স্থানে ৩ হাজার তিনশত উনচল্লিশ জন দেবদেবীর কথা বলা হয়েছে -ঋগবেদ,মন্ডল-৮ সুক্ত-৩। কিন্তু অন্যত্র শুধুমাত্র ৩৩ জনেরই কথা বলা হয়ে থাকে তবে তাদের মূলত প্রধান ঈশ্বর একজন -এই ধারণা ও আছে।

তেত্রিশ দেবতার নাম বৈচিত্র্যময়। এর মধ্য থেকে নিম্নে ভাগবত পুরাণ অনুসারে দ্বাদশ আদিত্য, ভাগবত পুরাণ অনুসারে একাদশ রুদ্র ও মতান্তরে একাদশ রুদ্র , মহাভারত অনুসারে অষ্টবসু, এবং দুই অশ্বিন।

এছাড়া ধর্মের সকল শাস্ত্র খোঁজ করে চারশত এর বেশি দেবদেবীর সংখ্যা বা নাম খুজে পাওয়া যায় না। এরমধ্যে প্রায় দুইশত এর মত দেবদেবীর পূজা হিন্দুধর্মাবলম্বীগণ কম বেশি করে থাকেন, কোনো কোনো দেবতা একই ব্যক্তি কর্তৃক একাধিকবার পূজিত হতে পারেন। ঘোষিত ৩৩ কোটি দেবতার তুলনায় জানা দেবতার সংখ্যা সীমিত। বহু দেবতার কোনো ভক্ত নেই বললেও চলে।

দেবতা ও অসুরের অসামঞ্জস্যতা

অসুর - হল একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর জীব বা শক্তিকামী গোত্র যা হিন্দুধর্মের কল্যাণকামী সত্ত্বা দেবের (সুর নামেও পরিচিত) সঙ্গে অধিক সম্পর্কযুক্ত। পরিভাষাটিক ভাষাগতভাবে ইন্দো-ইরানীয় ও প্রাক-জরাথুস্ত্রবাদী যুগের অহুরের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে ধারণা করা হয়।

অসুরেরা সবসময় দেবদের সঙ্গে যুদ্ধ করে থাকে। ভারতীয় পাণ্ডুলিপিতে অসুরদেরকে শক্তিশালী অতিমানব অর্ধদেবতা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যাদের ভালো কিংবা খারাপ গুণাবলি থাকে। ভালো অসুরদের বলা হয় আদিত্য আর তারা বরুণের দ্বারা পরিচালিত হয়, অপরদিকে অকল্যাণকামী অসুরদের বলা হয় দানব এবং তারা বৃত্রের দ্বারা পরিচালিত হয়।বৈদিক পাণ্ডুলিপির প্রাচীনতম অংশগুলোতে অগ্নি, ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাদেরকেও অসুর বলে ডাকা হয়েছে, কারণ তারা নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্র, জ্ঞান বা ক্ষমতার "অধিপতি"। পরবর্তী বৈদিক ও বৈদিক-পরবর্তী লেখনীসমূহে, কল্যাণকামী দেবতাদের দেব বলা হয়েছে, যেখানে অকল্যাণকামী অসুরেরা উক্ত দেবদের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করে, যাদেরকে "দেবতাদের শত্রু" হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

দেব, যক্ষ (প্রাকৃতিক আত্মা) ও রাক্ষসদের (ভূত, দৈত্য) পাশাপাশি অসুররা হল ভারতীয় পৌরাণিকতার অংশ। হিন্দুধর্মে বহু মহাজাগতিক তত্ত্বে অসুরদেরকে তুলে ধরা হয়।

অসুরের আহারাভাব হলেই দল বেঁধে পাহাড় হতে, সমুদ্রকূল হতে গ্রাম নগর লুঠতে এল। কখনও বা ধনধান্যের লোভে দেবতাদের আক্রমণ করতে লাগল। দেবতারা বহুজন একত্র না হতে পারলেই অসুরের হাতে মৃত্যু; আর দেবতার বুদ্ধি প্রবল হয়ে নানাপ্রকার যন্ত্রতন্ত্র নির্মাণ করতে লাগল। ব্রহ্মাস্ত্র, গরুড়াস্ত্র, বৈষ্ণবাস্ত্র, শৈবাস্ত্র—সব দেবতাদের; অসুরের সাধারণ অস্ত্র, কিন্তু গায়ে বিষম বল। বারংবার অসুর দেবতাদের হারিয়ে দেয়, কিন্তু অসুর সভ্য হতে জানে না, চাষবাস করতে পারে না, বুদ্ধি চালাতে

জানাতে না। বিজয়ী অসুর যদি বিজিত দেবতাদের স্বর্গে রাজ্য করতে চায় তো সে কিছুদিনের মধ্যে দেবতাদের বুদ্ধিকৌশলে দেবতাদের দাস হয়ে পড়ে থাকে। নতুবা অসুর লুঠ করে পরে আপনার স্থানে যায়। দেবতারা যখন একত্রিত হয়ে অসুরদের তাড়ায়, তখন হয় তাদের সমুদ্রমধ্যে তাড়ায়, না হয় পাহাড়ে, না হয় জঙ্গলে তাড়িয়ে দেয়। ক্রমে দু-দিকেই দল বাড়তে লাগল লক্ষ লক্ষ দেবতা একত্র হতে লাগল, লক্ষ লক্ষ অসুর একত্র হতে লাগল। মহাসংঘর্ষ, মেশামেশি, জেতাজিতি চলতে লাগল।

এভাবেই দেব ও অসুর কে ঋগ্বেদ থেকে শুরু করে হিন্দধর্মের বিভিন্ন শাস্ত্রে দেব ও অসুর কে কখনো একই গোষ্ঠী তে ফেলে আবার কিছু জায়গায় ভিন্নরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে, অনেক পন্ডিতের মতে ইন্দ্র প্রথমের দিকে অসুর হিসেবে অনেক পরশুজন ও নিম্নমাদ্র নরনারী, পুরুষ, শিশু কে নির্মমভাবে হত্যা করেছে, অনেক অত্যাচার করা হয়েছে তাদের উপর ইন্দ্রের নেতৃত্বে আবার অপর দিকে কয়েক শতাব্দী পর ইন্দ্র দেবতা হিসেবে পূজিত হয়, অর্থাৎ ইন্দ্রকে অসুর ও দেবতা দুই রুপই দেয়া হয় ঋগবেদ।

অসুর জাতির কিছু ইতিকথা

ভারতীয় সংস্কৃতিতে দ্রাবিড় জাতির অবদান কম নয়। প্রাচীন দ্রাবিড় সভ্যতা সম্পূর্ণভাবে আর্যভাবশূন্য। আর্যদের সঙ্গে তাঁদের সমাজগঠনেরও পার্থক্য ছিল। দ্রাবিড়-সমাজে মাতৃপক্ষ পরিবার থেকে পরিবার গঠিত হত, আর্যসমাজে কিন্তু পিতৃপক্ষ থেকে পরিবার গঠিত হত। তথাকথিত 'অসুর' সমাজের সঙ্গে দ্রাবিড় সমাজ গঠনের অনেকটা মিল পাওয়া যায়। আর্যরা যাঁকে 'ময় অসুর' বলে নিন্দা করেছিলেন, সেই 'ময়'ই, দ্রাবিড় সভ্যতার বিজ্ঞান সাধনায় চরম সাক্ষ্য-দান করেছিলেন। পূর্ত ও স্থপতি-বিদ্যার আর্য আদর্শ হলেন 'বিশ্বকর্মা', আর দ্রবিড় আদর্শ হলেন 'ময়দানব'। 'সুমেরীয়', 'কাল্ডীয়', 'ঈজীয়' ও 'মিশরীয়' সভ্যতার উপরে দ্রাবিড় সভ্যতার প্রভাব পড়েছিল বলে গবেষকরা মনে করেন। দ্রাবিড় জাতি নৌ-বিদ্যায় পারদর্শী ছিল, দ্রাবিড়

ভাষায় সেটার পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃত নৌ-সম্বন্ধীয় শব্দাবলী দ্রাবিড় ভাষা থেকেই নেওয়া হয়েছিল। দ্রাবিড় জাতি যে বাইরে থেকে ভারতে এসেছিল - এই ধরনের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতি প্রাচীনকালে যে ভারতবর্ষ ও মেসোপোটেমিয়ার মধ্যে যোগাযোগ ছিল, সেটা ২১০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের একটি ফলক ও অন্যান্য নিদর্শন থেকে প্রমাণিত হয়। ঐতিহাসিকরা প্রত্নানুসন্ধান করে বৈদিক দেবতাদের মধ্যে ছয়জনকে ভারতের বাইরে অতি দূরদেশে খুঁজে পেয়েছিলেন। 'ইন্দ্র', 'মিত্র', 'বরুণ', 'নাসত্য', 'সূর্য' ও 'মরুৎ' - এই ছয়জন দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায় বোগাসকুই শিলালেখে, তেল-এল-অমরনার পত্রাবলী এবং ব্যাবিলনের কাসাইটদের রেকর্ডসমূহে। ইরানী জাতিও সম্ভবতঃ ভারত থেকে পশ্চিমে অগ্রসর হয়েছিল। গবেষকদের মতে তাঁরাও বেদবর্ণিত অসুর জাতির সমপর্যায়ভুক্ত।

বিশ্ব ইতিহাসে দুটি সর্বাধিক প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথমটি হল 'ঋগ্বেদ' এবং দ্বিতীয়টি হল 'আবেস্তা'। 'আবেস্তা' বা 'জেন্দ আবেস্তা' হল 'জরাথুস্ট্রবাদের' পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। 'জরাথুস্ট্রবাদ' একটি অতিপ্রাচীন 'ইরানীয় একেশ্বরবাদী ধর্ম' বা ধর্মীয় মতবাদ। ভারতীয় উপমহাদেশে সেটি 'পারসী ধর্ম' নামেও পরিচিত। গবেষকরা বেদ ও আবেস্তার তুলনামূলক আলোচনা করে, ঋগ্বেদকেই প্রাচীন বলে আখ্যা দিয়েছেন। কারণ, বেদের অনেক আখ্যানের সঙ্গে অবেস্তার আখ্যানের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। আবেস্তা অনুসরণকারীদের ক্ষৌরকর্মের প্রণালী, পরিধেয়ের পদ্ধতি, তাঁদের জয়ধ্বনি সূচক শব্দের সঙ্গে আর্যদের অনেক মিল পাওয়া যায়। আবেস্তার 'ষণ্ড', 'মর্ক', 'বেরেত্রেয়', 'ত্রেতন' হল অথর্ববেদের 'ষণ্ড', 'মর্ক', 'বৃত্রঘ্ন', 'ত্রিতআপ্ত্য'। ঐতিহাসিকদের মতে, বেদপন্থী ও অবেস্তাপন্থীদের পূর্বপুরুষরা আগে একই জায়গায় একই সঙ্গে বাস করতেন। তাঁরা যেখানে থাকতেন, সেই জায়গাটাকে তাঁরা 'স্বর্গ' বলতেন। বেদপন্থীদের পূর্বপুরুষরা নিজেদের 'দেব' বলতেন ও অন্য দলকে 'অসুর' নামে অভিহিত করতেন। তখন দেব ও অসুর 'ঈশ্বর' (Lord) অর্থেই প্রযুক্ত হত। সেই সময় দেব ও অসুরদের পরস্পরের মধ্যে বেশ মিল ছিল। তাঁরা পরস্পর পরস্পরকে 'ভ্রাতৃব্য' বলে বুঝতেন। সহোদর ভ্রাতা না হলে

তখন ‘ভ্রাতৃব্য’ বলে পরিচয় দেবার কথা ছিল। এখন যেমন পিতৃব্য বললে পিতাকে না বুঝিয়ে কাকা, জ্যাঠাকে বোঝায়; তখন তেমনি ‘ভ্রাতৃব্য’ বললে সহোদর ভ্রাতা না বুঝিয়ে অন্য সবাইকে বোঝানো হত। ক্রমে উভয় দলের মধ্যে ধর্মমতের পার্থক্য ঘটেছিল।

‘ভৃগু’ অগ্নিপূজার প্রবর্তন করেছিলেন। দেবগণ যজ্ঞ করতে শুরু করেছিলেন। প্রথম প্রথম অসুরেরাও তাতে যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু পরে তাঁরা আর যজ্ঞ করতে রাজি ছিলেন না। শেষে পরিস্থিতি এমন হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, দেব বললে যজ্ঞকারী মাত্রই বোঝানো হত। ‘শতপথ-ব্রাহ্মণ’ (১.৫.৫.২৬) তাই দেবের সংজ্ঞা দিয়েছে - ‘‘যজ্ঞেন বৈ দেবাঃ’’। অসুরেরা সারা বৈদিক সাহিত্যে স্বর্গবাসী। প্রথম প্রথম ‘অসুর’ শব্দটি বৈদিক যুগের দেবতাদের কাছে খুব শ্রদ্ধাবাচক, মর্যাদাব্যঞ্জক ছিল। বৈদিক যুগের গোড়ার দিকে যাঁরা খুব বড় হতেন, তাঁরা অসুর উপাধিতে ভূষিত হতেন। ‘মরুৎ’, ‘দ্যৌ’, ‘বরুণ’, ‘ত্বষ্টা’, ‘অগ্নি’, ‘বায়ু’, ‘পুষা’, ‘সবিতা’, ‘পর্জন্য’ - এঁরা সকলেই বেদে সম্মানসূচক ‘অসুর’ পদবাচ্য ছিলেন। তাঁদের অলৌকিক শক্তি ছিল বলে, বৈদিক ঋষিরা তাঁদের ‘অসুর’ বলতেন। বেদে অন্ততঃ ১৫০ বার ‘অসুর’ শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেগুলো সবই ভাল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছিল। কেবলমাত্র ১৫ বার শব্দটি দুষ্ট অর্থে ব্যবহার করা হয়েছিল। যতদিন দেব ও ‘অসুর’ মিল ছিল, ততদিন ‘অসুর’ বললে মর্যাদা ও প্রভাব বোঝাত। কিন্তু যখন মনের অমিল হতে শুরু হয়েছিল, তখন তাঁরা উভয়ে উভয়ের প্রতি আকর্ষণ ভুলে গিয়েছিলেন। ফলে উভয় দলের মধ্যে বেশ শত্রুতার সৃষ্টি হয়েছিল। প্রথম প্রথম এক এক জন অসুরের সঙ্গে এক এক জন দেবতাদের যুদ্ধ হত। শেষে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে একদল অন্য দলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে শুরু করেছিলেন। যুদ্ধের শুরুর দিকে অসুরেরা দেবতাদের জ্বালিয়ে মারতেন। শেষে দেবতারা বহু কষ্টে ছলে-কৌশলে জয়ী হয়েছিলেন। এই সম্পর্কে বিষ্ণুর ত্রিবিক্রমের উদাহরণ খুব প্রসিদ্ধ। যুদ্ধের সময় দেব ও অসুর উভয়েই ‘ইন্দ্র’কে পাবার জন্য, তাঁর সাহায্যের জন্য চেষ্টা করেছিলেন। ঋগ্বেদে (১.৭.১০) ইন্দ্র সম্পর্কে দেবতারা বলেছিলেন - ‘‘অস্মাকংস্তু কেবলঃ’’। অসুরদের বিক্ষিপ্ত করে দেবার জন্য

ইন্দ্রকে তাঁরা বার বার ডেকেছিলেন (৮.৮৫. ৯)। 'অগ্নি' তাঁদের ভরসা দিয়েছিলেন যে, অসুরদের বিধ্বস্ত করবার জন্য তিনি; মন্ত্র তৈরি করে দেবেন (১০.৫৩.৪)। অসুরদের মধ্যে বড় বড় বীর ছিলেন। 'পিপরু' অসুরের, 'শম্বর' অসুরের অনেকগুলি দুর্গ ছিল। 'শম্বরের' অন্ততঃ ৯০টি (১.১৩০.৭) কিংবা ৯৯টি (২.১৯.৬) দুর্গ ছিল। 'বর্চী' অসুরের লক্ষ লক্ষ যোদ্ধা ছিল। তিনি নিজেও খুব দুর্দান্ত যোদ্ধা ছিলেন।

দেবতাদের অনেক সময় সেই সব দুর্দান্ত অসুরদের উপরে নির্ভর করতে হত (১০.১৫১.৩১)। যখন যুদ্ধ লাগত তখন - ইন্দ্র, বিষ্ণু, অগ্নি, সূর্য - দেবতাদের হয়ে যুদ্ধ করতেন। ইন্দ্র একা অসুর 'পিপরু'র দুর্গ নষ্ট করে দিয়েছিলেন (১০.১৩৮.৩)। ইন্দ্র ও বিষ্ণু মিলে অসুর 'বর্চী'র লক্ষ বীরকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিলেন (৭.৯৯.৫)। অসুরদের সঙ্গে অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করে ইন্দ্র (৬.২.৪), অগ্নি (৭.১৩.১) ও সূর্যের (১০.১৭০.২) নাম হয়েছিল - 'অসুরহা'। 'রুদ্র' ছিলেন 'মহা অসুর' (৫.৪২.১১), অসুরেরা তাঁর ভক্ত ছিলেন। দেবাসুরের যুদ্ধের পর থেকে যখন দেবতারা অসুরদের একেবারে সরিয়ে দিয়েছিলেন (১০.১৫৭.৪) সেই সময় থেকে তাঁরা অসুরদের শত্রু বলে উল্লেখ করতেন। তখন থেকে দেবতারা তাঁদের 'ভ্রাতৃব্য' বলে ভর্ৎসনা করতেন। 'তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণে' তাই দেখতে পাওয়া যায় - ''এতয়া বৈ দেবা অসুরান্নতৎ ক্রামন্নতি পাপ্মানং ভ্রাতৃব্যং ক্রামতি য এতয়া স্তুতে।'' সেই সময় থেকে ভ্রাতৃব্য আর ভাই ছিল না; ভ্রাতৃব্য শব্দের অর্থ হয়ে গিয়েছিল শত্রু। পরে যে কারণেই হোক, এমন হয়েছিল যে, দুই দলের মধ্যে আর কোন সম্পর্ক ছিল না। অসুরদের আরও একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তাঁরা 'গুহ্য বিদ্যা' জানতেন। সেই বিদ্যার নাম ছিল 'মায়া'। সেটারই প্রভাবে তাঁরা অসামান্য শক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠেছিলেন। যখন দেবতারা অসুরদের কাছ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন, সেই সময়ে বা সেই সময়ের পরে যে সমস্ত সাহিত্য রচিত হয়েছিল, সেগুলোতে অসুরদের স্নেহের দৃষ্টিতে দেখানো হয়নি। তাই 'শতপথ-ব্রাহ্মণে' বলা হয়েছে, দিন দেবতাদের, আর অসুরদের সঙ্গী অন্ধকার (২.৪.২.৫)। 'তৈত্তিরীয় সংহিতা'তেও বলা হয়েছে যে, রাত্রি অসুরদের (১.৫৯.২)। তবে সব গ্রন্থেই একথা বলা হয়েছে যে, অসুররা হলেন 'প্রজাপতির সন্তান'। আগে

তাঁরা দেবতাদের সমান ছিলেন। বৈদিক যুগের শেষের দিকে অসুর বললে আর দেবতা বোঝাতো না; পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে অসুর শব্দের অর্থ একেবারে পাল্টে গিয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছিল - 'অপদেবতা'। 'শতপথ ব্রাহ্মণে' অসুরদের 'রাক্ষস' বলা হয়েছে। একই সাথে বলা হয়েছে যে তাঁরা 'দেবনিন্দক'। তবে 'প্রজাপতি' যে দেব ও অসুরদের পিতা, 'শতপথ' সেটা স্বীকার করে নিয়েছে। 'শতপথ ব্রাহ্মণ' গ্রন্থে অসুরদের 'মেরু-নিম্নবাসী' বলা হয়েছে। 'মায়া' বলে একটি গ্রন্থ ছিল অসুরদের বেদ। 'পরাবসু' ছিলেন সেটির হোতা। তাতে 'নমুচি অসুর', 'স্বর্ভাবু অসুর', 'কপিল অসুর', 'কালকাঙ্গ অসুর' প্রভৃতির কথা ছিল । 'কালকাঙ্গ অসুর' রাশীকৃত অগ্নিবেদী করে স্বর্গে উঠবার চেষ্টা করেছিলেন। পুরাণে অসুরদের নিয়ে অনেক কথা পাওয়া যায়। পুরাণ বর্বরদের - অসুর ও রাক্ষস - এই সাধারণ নামে আখ্যাত করেছে। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলি পাঠ করলে বেশ বুঝতে পারা যায় যে, অসুরেরা আদতে 'রুদ্রোপাসক' ছিলেন। তাই তাঁদের 'শৈব'ও বলা যেতে পারে। 'লিঙ্গপুরাণ' অনুসারে, অসুর ও রাক্ষসরা যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম করে দেবাদিদেব শিবের কাছ থেকে কয়েকটি বর পেয়েছিলেন।

শিবের রক্ষিত হয়ে তাঁরা দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন ও তাঁদের পরাভূত করেছিলেন। শেষে ইন্দ্র সমেত অন্যান্য দেবগণ, শিবের কাছে একজন বিঘ্নবিনাশকারী 'বিঘ্নেশ্বর'কে সৃষ্টি করবার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। 'লিঙ্গপুরাণ' অনুযায়ী - ''বিঘ্নেশ্বর অসুর ও রাক্ষসদের পুণ্য সঞ্চয়ে বাধা জন্মাইবেন, তাহা হইলে তাঁহারা আর শিবের নিকট বর পাইবেন না। শিব সন্তুষ্ট হইলেন। পার্বতীর গর্ভে শিবাংশ বিঘ্নেশ্বর জন্মগ্রহণ করিয়া বিঘ্ন জন্মাইতে ও দেবতাদের শুভফল উৎপাদন করিতে লাগিলেন।'' 'মৎস্যপুরাণ' অনুসারে, দেবাসুরে ১২ বার যুদ্ধ হয়েছিল (৩৯-৫২ অঃ)। (৫৮ অঃ) 'প্রহ্লাদ' যখন পরাজিত হয়েছিলেন, তখন ইন্দ্র ত্রিলোকের অধিপতি হয়েছিলেন। অসুরগুরু 'শুক্র' অসুরদের ত্যাগ করে দেবতাদের কাছে চলে গিয়েছিলেন। অসুরেরা তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যে, যেন তিনি তাঁদের পরিত্যাগ না করেন। শুক্র তাঁদের সাহায্য করবেন বলে আশ্বস্ত করেছিলেন (৬০ অঃ)। কিন্তু

দেবতারা আবার অসুরদের আক্রমণ করেন। অসুরেরা শুক্রের কাছে যাওয়ায় আক্রমণকারীরা ফিরে গিয়েছিলেন - ‘‘শুক্র তাঁহাদের পূর্বকৃত অপরাধের কথা স্মরণ করাইয়া সৌভাগ্যোদয়ের জন্য অপেক্ষা করিতে বলেন। তিনি আরও বলেন, ‘যাও, শিবের ধ্যান কর; শিবের নিকট কয়েকখানি শস্ত্র প্রার্থনা কর; তাহাদেরই প্রভাবে তোমাদের জয় হইবে (৬৫ অঃ)।’ তখন তাঁহারা দেবতাদের নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আর শত্রুতাচরণ করিবেন না; তাঁহারা তপ করিবেন। শুক্র মহাদেবের নিকট গিয়া দেবগুরু বৃহস্পতি অপেক্ষা অধিকতর প্রভাবশালী গ্রন্থ প্রার্থনা করিলেন। মহাদেব তাঁহাকে একটি কঠিন অনুষ্ঠান করিতে বলিলেন। এক হাজার বৎসর ঊর্ধ্বপদ হইয়া তাঁহাকে তিনি তপ করিতে বলেন। শুক্র তাহাতেই রাজি হইলেন। অসুরদের এই নিঃসহায় অবস্থার সুযোগ পাইয়া দেবতারা তাঁহাদের আক্রমণ করিলেন। অসুরেরা শুক্রের মাতার নিকট গেলেন। তিনিও সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু দেবতারা আবার আক্রমণ করিলেন। শুক্রমাতা তখন মায়া বলে ইন্দ্রকে অসহায় করিলেন ...’’ ইত্যাদি।

‘অগ্নিপুরাণে’ বলা হয়েছে যে, অসুর ‘হয়গ্রীব’ ব্রহ্মার কাছ থেকে বেদ অপহরণ করেছিলেন। বিষ্ণু তাঁকে হত্যা করেছিলেন। ‘ভাগবতপুরাণে’ দেবাসুরের সমুদ্র মন্থনের কথা পাওয়া যায়। ‘কূর্ম’ ও ‘বায়ুপুরাণে’ ‘হিরণ্যকশিপু’র কাহিনী পাওয়া যায়। এইভাবে প্রাচীন পুরাণগুলোতে অসুরদের নিয়ে বহু কথাই পাওয়া যায়। ‘মহাভারতে’ ‘বাণাসুরের’ কথা আছে। ‘বাণাসুর’ ছিলেন ‘রুদ্রোপাসক’। তিনি ‘বাণ’ প্রতীকে লিঙ্গোপাসনা করতেন বলে তাঁর নাম ‘বাণ’ হয়েছিল। ‘বিষ্ণুপুরাণ’ তাঁকে ‘দেব রুদ্রোপাসক’ বলেছে। ‘হরিবংশ’, ‘ভগবত’ ও ‘বিষ্ণুপুরাণ’ গ্রন্থে তাঁকে ‘বাণরাজ’ বলা হয়েছে। ‘ঐতরেয় ব্রাহ্মণ’ তাঁকে ‘ইষুক্রিকাণ্ড’ বলেছে। বাণরাজ ও তাঁর অনুব্রত অসুরেরা বাণেরই রুদ্রোপাসনা করতেন। এর জন্যই সনাতন মুর্তিতত্ত্ব অনুসারে অসুরের মূর্তির হাতে একটি বাণ দেবার ব্যবস্থা আছে। ‘ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ’ প্রতীচ্য ‘সত্ত্ব শ্যাপর্ণগণ’ সম্পর্কে বলেছে - ‘‘পুতায়ৈ বাচো বদিতারঃ।’’ এঁরা পবিত্র ভাষা বলতেন। ‘পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে’ ‘ব্রাত্যবাণের’ ভাষা জঘন্য বলে তাঁর নিন্দা করা হয়েছে। ‘শতপথ-

ব্রাহ্মণে' (৩.২.১.২৪) অসুরদের ভাষার নিন্দা করা হয়েছে আর ব্রাহ্মণরা যাতে ভাষা ম্লেচ্ছিত না করেন, তার জন্য উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তাই ঐতরেয় ব্রাহ্মণের উক্তি করা হয়েছে - ''ন ব্রাহ্মণে শ্লেচ্ছেৎ।'' 'পতঞ্জলি'ও সেটার প্রতিধ্বনি করে বলেছিলেন - ''তেহসূয়া হেলয়ো হেলয়ো ইতি কুর্বন্তঃ পরাবভূবুঃ তস্মাৎ ব্রাহ্মণেন ন ম্লেচ্ছিতং বৈ নাপভাষিতং বৈ।'' 'পাণিনি' (৬.১.১৬০) ম্লেচ্ছ বা অসুরদের শব্দকে 'উহ্য' শব্দের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। পাণিনির সময়ে অসুরেরা বিশেষ 'যোদ্ধৃজাতি' ছিলেন। 'যোদ্ধৃ' পশুজাতির সঙ্গে পশুগণের ম্লেচ্ছভাষাভাষী অসুরদের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'শতপথ ব্রাহ্মণে' 'ম্লেচ্ছ' বলিতে 'বর্বর' (barbarian) শব্দকে বোঝানো হয়েছে।

পুরাণে অসুর শব্দ 'অসু' (অর্থাৎ প্রাণ) থেকে নিষ্পন্ন করা হয়েছে। 'বায়ুপুরাণের' নবম অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, 'প্রজাপতির জঘন' থেকে অসুরদের উৎপত্তি হয়েছে -

''ততোহস্য জঘনাৎ পূর্বমন্থরা জঞ্জিরে সুতাঃ।

অস্থঃ প্রাণঃ স্মৃতো বিপ্রাস্তজ্জন্মানশ্চতোহসুরাঃ॥'' (৪)

ঋগ্বেদে 'অসুর' শব্দের যথেষ্ট প্রয়োগ পাওয়া যায়। ১.৩৫.৬ ঋকের ভাষ্যে 'সায়নাচার্য' লিখেছিলেন - ''অসুরঃ অসু ক্ষেপণে অস্যতি শত্রুন্ ইত্যাসুরঃ। অসেরুরন। উ, ১. ৪৩ নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বম্। যদ্বা। অসুন্ প্রাণান্ রাতি দদাতি ইত্যসুরঃ।'' এছাড়াও বলা হয়েছে

''সমৎসরেণাসুর ইত্যুপেয়ুষা চিরায়

নাম্নঃ প্রথমাভিধেয়তাম্।

ভয়স্য পূর্বাবতরস্তরস্বিনা মনঃসু

যেন হাসদাংন্যধীয়ত॥'' (৪-৩)

যে উড়িয়ে দেয়, তাঁকে অসুর বলে। বহুকাল পরে সেই বলবান দানব অসুর নামের প্রকৃত পাত্র হয়ে উঠেছিল; হিংসায় দেবগণের মনে ভয়ের প্রথম সঞ্চার হয়েছিল। 'যাস্কের নিরুক্তে' (৩-৮) অসুর শব্দের একটি নিরুক্তি দেওয়া হয়েছে। 'যাস্ক'

বলেছিলেন, ব্রহ্মা 'সু' অর্থাৎ যেটা ভাল, সেটা থেকে 'সুরে'র উৎপত্তি করেছিলেন; আর 'অস্', অর্থাৎ খারাপ ধাতু থেকে 'অসুরের' সৃষ্টি করেছিলেন।

বৈদিক যুগের শেষভাগে অসুরেরা আর্যদের থেকে আলাদা হয়ে পড়েছিলেন এবং ভারতের গণ্ডী পার করে 'পারস্য' বা 'তুর্কীস্তানে' গিয়ে বসবাস শুরু করেছিলেন। আর্যগণ যখন ভারতে বেশ জাঁকিয়ে বসেছিলেন, তখন যে সমস্ত অসুর ভারতের বাইরে যেতে পারেননি, তাঁরা হাঁটতে হাঁটতে 'প্রয়াগ', 'ছোটনাগপুর', 'মির্জাপুরের' দিকে গিয়ে আড্ডা গেঁড়ে বসেছিলেন। কেউ কেউ আবার 'তিব্বত' দিয়ে 'কামরূপ' চলে গিয়েছিলেন। কেউ কেউ দক্ষিণ-ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। যাঁরা ভারতের বাইরে গিয়েছিলেন, তাঁদের প্রভাব ও পরাক্রম বৃদ্ধি পেলে, প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে, তাঁরা 'ব্যাবিলনের' একশো ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে একটি সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। সেই সাম্রাজ্যের নাম হয়েছিল 'অসুর' বা 'আসিরিয়া'। 'টাইগ্রীস' নদীর উপকূলে 'অসুর' নামে সেই সাম্রাজ্যের রাজধানীও স্থাপিত হয়েছিল। 'এশিয়া-মাইনর' থেকে 'ককেশস' পর্বত পর্যন্ত সেই অসুরদের অধিকার বিস্তৃত হয়েছিল। সেই ঘটনার কিছু আগে, ভারতবর্ষ থেকে আগত 'সুবীর'রা 'সুমেরিয়া' স্থাপন করেছিলেন। 'মেসোপটেমীয়' জাতিরা দ্রাবিড় সভ্যতা অর্জন করেছিলেন। বড় বড় পণ্ডিতদের মধ্যে কারো কারো ধারণা যে, ভারতবাসীরা নাকি বিদেশী সভ্যতা ধার করে আত্মসাৎ করতে খুব পটু! আবার কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে, ভারতবাসীরা তাঁদের সভ্যতার ব্যাপারে 'গ্রীস' ও 'বাট্রিয়া'র কাছে অনেকাংশে ঋণী। তাঁদের মধ্যে আবার এক শ্রেণীর লেখক বলে থাকেন যে, 'পারস্য প্রভাব' ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করেছে। এক সময় যে 'সুমরগণ' পারস্যোপসাগরের অন্তরীপে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন, একথা কিন্তু অস্বীকার করতে পারা যায় না। আর সেই সুমেরুরাই যে দ্রাবিড় জাতীয় ছিলেন, তাতে ঐতিহাসিকদের কোন সন্দেহ নেই।

'মেসোপটেমিয়া'য় 'ব্যাবিলনীয়' ও 'আসিরী'য় জাতির প্রাচীন সভ্যতার যে বিস্ময়জনক নিদর্শন পাওয়া যায়, সেই সভ্যতার জন্য তাঁরা সুমেরদের কাছেই ঋণী ছিলেন। দ্রাবিড় জাতির উৎপত্তির ইতিহাস আজও অন্ধকারাচ্ছন্ন। দ্রাবিড়রা ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন

জাতি। কেউ কেউ বলেন যে, তাঁরা সর্বপ্রথমে ভারতের বাইরে কোন দেশে বাস করতেন। যদি সেটাই হয়, তাহলে এখন তাঁদের আদিম নিবাসের সন্ধান পাওয়া অতি দুরূহ বিষয়। আজ পর্যন্ত দ্রাবিড়দের আদিম বাসস্থান সম্বন্ধে কেউই নিশ্চিত ভাবে কোন কথা পারেননি। কিন্তু ভারতবর্ষে দ্রাবিড় জাতি অতি প্রাচীনকাল থেকেই ছিল। গবেষক 'হনলি' (Hunley) মত প্রকাশ করেছিলেন যে, দ্রাবিড়দের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার আদিমবাসীদের সম্পর্ক ছিল। গবেষক 'স্কোটার'ও (Sclater) অনুমান করেছিলেন যে, আগে একটি বহুবিস্তৃত মহাদেশ ভারতবর্ষ, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়াকে সংযুক্ত করে অবস্থিত ছিল। সেটা এখন ভারত মহাসাগরের গর্ভে নিমজ্জিত। স্কোটারের অনুমান সত্যি হলে দ্রাবিড় জাতির পক্ষে অতি প্রাচীনকালে স্থলপথে ভারতবর্ষে এসে উপনিবেশ স্থাপন করা বিচিত্র নয়। কিন্তু 'স্যর উইলিয়ম টার্নার' (Sir William Turner) প্রমাণ করেছেন যে, দ্রাবিড়রা ভারতবাসী। 'বেলুচিস্তানের' সুদূরবর্তী উচ্চ ভূখণ্ডের মধ্যভাগে 'ব্রাহুই'রা বাস করেন। তাঁদের ভাষা আলোচনা করলে দেখা যায় যে, তাঁদের ভাষার সঙ্গে দ্রাবিড় ভাষার কাছাকাছি সম্বন্ধ রয়েছে। এছাড়া তাঁরা যে সুমের-বংশভুক্ত, সেটারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। গবেষক 'গ্রীয়ারসনের' লেখা মতগুলি বিশেষ করিয়া আলোচনা করলে দেখা যায় যে, দ্রাবিড়দের মধ্যে 'ব্রাহুই'রাই বিশেষভাবে জাতীয় ভাব বজায় রেখে আসছে। অতএব 'সুমের'রা যে ভারতবর্ষ ও কাছাকাছি সব জায়গা থেকে ঐ প্রদেশে গিয়ে সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, সেটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। 'ব্রাহুই'রা যদি দ্রাবিড়দের জাতীয় ভাব রক্ষা করে থাকে, তাহলে নিঃসন্দেহে এটা অনুমান করা যেতে পারে যে, দ্রাবিড়রা আগে বেলুচিস্তানেই থাকত, সেখান থেকেই তাঁরা ভারতবর্ষে এসেছিল। 'ভ্রেড্রেনবার্গের' ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে যে, এক সময়ে বেলুচিস্তানের মরুপ্রদেশ অত্যন্ত উর্বর ও জনাকীর্ণ ছিল। কিন্তু পরে জলাভাব হওয়ায় সেই জায়গা অজন্মা ও দুর্ভিক্ষপীড়িত হয়ে যায়। সেই জন্য সেখানে থাকা লোকজন বাধ্য হয়ে অন্যত্র নিজেদের উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। 'সিন্ধুনদের' তীরভূমি উর্বর দেখে অনেকে দলে দলে সেইখানে এসে বাস শুরু করেছিলেন। দ্রাবিড় জাতির অন্য এক শাখা

অদৃষ্টান্বেষণে পশ্চিমদিকে গিয়ে ‘ইউফ্রেটিস’ নদের তীরে উপস্থিত হয়েছিল। তাঁরা হয় ‘পারস্যের’ পার্বতীয় প্রদেশ থেকে ‘ব্যাবিলোনিয়া’র সমতল ভূমিতে অবতরণ করেছিল, না হলে সমুদ্রপথে ‘বেলুচিস্তানের মাকরানের’ (Makran) সমুদ্রোপকূল থেকে উপস্থিত হয়েছিল। ‘সুমের’ ও দ্রাবিড়দের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। (First Town Planners, Anukul Chandra Ghosh) ‘ইউফ্রেটিস’ উপত্যকার প্রাচীন জাতিরা উচ্চ সভ্যতা লাভ করেছিল। ‘সুমের’ জাতিই ছিল সেই সভ্যতার পথপ্রদর্শক। গবেষক ‘হল’ (H. R. Hall) সেই সুমের জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, সুমের সভ্যতা বাইরে থেকে মেসোপটেমিয়ায় এসেছিল এই ধরনের অনুমান করবারও অনেক কারণ আছে। সুমেররা যে ভারতবর্ষীয় কোন জাতি, তাঁরা যে জলপথে এবং স্থলপথে পারস্যের মধ্য দিয়ে ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিসের মধ্যবর্তী উপত্যকায় উপনীত হয়েছিল, সেটা অসম্ভব নয়। ভারতবর্ষ মানব সভ্যতার প্রাচীনতম একটি কেন্দ্র, এই বিষয়ে সন্দেহ করবার বিশেষ কিছু নেই। যে সব ‘অ-সেমেটিক’ ও অনার্য জাতি পূর্বাঞ্চল থেকে পশ্চিমাঞ্চলে সভাতা বিস্তার করতে এসেছিল, তাঁরা এতটা ভারতীয় ভাবাপন্ন ছিল যে, তাঁদের ভারতীয় জাতি বলে মনে করা স্বাভাবিক। গবেষক ‘হল’, সুমেরদের বিশেষভাবে ভারতীয় ভাবাপন্ন বলেই মনে করতেন। ব্যাবিলোনিয়ার প্রাচীর নগরগুলির ভূগর্ভ খনন করে যে সব ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়েছিল, প্রত্নবস্তুতাত্ত্বিকরা সেগুলির সাহায্যে প্রমাণ করেছিলেন যে, দক্ষিণ ব্যাবিলোনিয়ায় উপনিবেশ স্থাপনকারী সুমেররাই ব্যাবিলোনীয় সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। সেই খননকার্য থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, সুমের-সভ্যতা এতদূর অগ্রসর হয়েছিল যে, সেখানকার লোকে তামা ব্যবহার করতে শিখেছিল। ‘তেল্লা’য় (Tella) সুমের জাতির খ্রীস্টের-জন্মের ৪ হাজার বছর আগের তামার তৈরি যন্ত্রপাতি পাওয়া গিয়েছিল। ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে ভারতের মধ্যপ্রদেশে কিছু প্রাগৈতিহাসিক তামার যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল । দেখা গিয়েছিল যে, ব্যাবিলোনিয়ায় প্রাপ্ত যন্ত্রগুলোর সঙ্গে সেগুলোর বিশেষ সাদৃশ্য ছিল। সুমেররা নগরনির্মাণে ও জল

প্রণালী খননকার্যে বিশেষ নিপুণ ছিল। যতদূর ইতিহাসে জানতে পারা যায়, সুমেররাই পৃথিবীর মধ্যে সবার আগে নগর কৌশল আবিষ্কার করেছিল।

তাঁদের প্রত্যেকটা নগরে একজন করে ‘নগর-দেবতা’ থাকতেন। তিনিই ‘নগরস্বামী’ বলে পরিগণিত হতেন। সেই দেবতার যিনি প্রধান পুরোহিত হতেন, তিনিই বংশানুক্রমে নগর শাসন করতেন। প্রাচীন ব্যাবিলোনিয়ার প্রধান নগর ‘নিপপুরে’ যে দেবমন্দির ছিল, সেটা ‘এনিল’ (Ennil) দেবকে উৎসর্গীকৃত হয়েছিল। সেই ‘এনিল’দেবের নামের সঙ্গে দ্রাবিড় জাতির ‘চন্দ্রদেবের’ নামের বেশ মিল পাওয়া যায়। ব্যাবিলোনীয় পুরাণে দ্রাবিড়দের সূর্যদেবের নাম ‘Bal’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ‘নিপপুরের’ মন্দিরে প্রাচীন ইতিহাসের অনেক উপকরণ পাওয়া গিয়েছিল। সেগুলোর সাহায্যে নির্ধারিত হয়েছিল যে, খ্রীস্টের-জন্মের ৬ হাজার বছর আগের সুমেররা বহু জনাকীর্ণ সুশাসিত নগরে বাস করত। ঐ সময়েরও বহু আগে তাঁরা সভ্যতাসম্পন্ন হয়েছিল। ঐ সময়েও তাঁরা ধাতুনির্মিত বস্তু ব্যবহার করত বলে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, তখনও তাঁরা লিখতে জানত। সুমেরদের যে সব খোদিত লিপি পাওয়া যায়, সেই সব মূর্তিতে দেখা যায় যে, সুমেররা মুণ্ডিত মস্তক ও লোহিত পরিচ্ছদাবৃত। তাঁদের আকৃতি ও পরিচ্ছদে দ্রাবিড়জাতিদের সঙ্গে এতটাই মিল যে, সেই উভয় জাতি যে একই সাধারণ জাতিসম্ভূত, তাতে সন্দেহ করবার কোন উপায় নেই। সেই সুমেরদের দিয়েই মেসোপটেমিয়ায় ব্যাবিলোনীয় ও আসিরীয় সভ্যতা সমুদ্ভাসিত হয়েছিল। সুমের আগমনের আগে আসিরীয় সভ্যতা ব্যাবিলোনীয় সভ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু সুমের-সভ্যতার সঙ্গে সংঘর্ষ হবার পরে আসিরীয় সভ্যতা ব্যাবিলোনীয় সভ্যতা থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। সেই উভয় জাতির শারীরিক গঠনের কোন পার্থক্য ছিল না। এমনকি ভাষাতেও তাঁদের সম্বন্ধ নিকটতর ছিল। কিন্তু সেটাও শেষে জাতীয় চরিত্রে বিভিন্ন হয়ে পড়েছিল। আসিরীয়রা ছিল সবল, দৃঢ় এবং যোদ্ধা জাতি, সমরসজ্জাতেই তাঁদের সভ্যতাবিস্তার করেছিল। তাঁদের বন্দীরা বড় বড় মন্দির, রাজপ্রাসাদ, প্রাচীর প্রভৃতি নির্মাণ করত। নারীরা শিল্প দ্রব্যাদি প্রস্তুত ও বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি করত। কৃষির ব্যাপার ক্রীতদাসদের উপরে ছেড়ে দেওয়া হত।

আসিরীরা বীরের পূজা করত। 'অসসুর' বা 'অসুর' ছিলেন তাঁদের জাতীয় দেবতা। তিনি প্রথমে গ্রাম্য দেবতা ছিলেন, পরে জাতির উপাস্য হয়েছিলেন। আসিরীয় প্রভাবের সময় সেই দেবতার বলে আসিরীয় রাজারা শত্রু জয় করেছিলেন। তাঁরা দেবতার মন্দির নির্মাণ করতেন। তাঁদের লিপি বা অনুশাসনগুলি সুমেরীয় ভাষায় লিখিত ছিল। তাঁদের মধ্যে গুরু পুরোহিতের প্রাধান্য খুব বেশী ছিল। আসিরীয়রা এক সময় এত ক্ষমতাশালী হয়েছিল যে, তাঁদের শাসনদণ্ড, কিছু সময়ের জন্য ভারতসাগর পর্যন্ত এবং ভূমধ্য সাগর থেকে গঙ্গার উপত্যকাভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। সেই বীরজাতির শৌর্যবীর্যের প্রভাব চারিদিকে বিঘোষিত হয়েছিল। আসিরীয়ার প্রাচীন রাজধানীর নাম ছিল 'অসসুর'। আগে 'অসুর' গ্রাম্য দেবতা ছিলেন। আসিরিয়া যেই মাথা তুলতে শুরু করেছিল, অমনি তাঁদের গ্রাম্য দেবতা জাতীয় দেবতায় পরিণত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর 'অসুর' নামটি অক্ষুণ্ণ রয়ে গিয়েছিল। সেই দেবতা একটু জটিল রকমের ছিলেন। তাঁর উৎপত্তি কেমন করে হয়েছিল, সেটা নিয়ে আজও ঐতিহাসিকরা কোন মীমাংসায় আসতে পারেন নি।

দেবদেবীর ক্ষমতা

হিন্দুশাস্ত্র থেকে জানা যায়, দেবদেবীর কোনো সার্বভৌম ক্ষমতা নেই বরং এরা অনেক সময় দূর্বল বলে জানা গেছে। কিছু শাস্ত্রে দেখা যায় মুনিঋষিগণ দেবতাদের থেকেও অনেক বেশি ক্ষমতাশালী ছিল । কোনো কোনো দেবতা অপর দেবতার বিরুদ্ধে ঋষিদের হস্তক্ষেপ কামনা করে। এমনকি ঋষিদের মোকাবিলায় প্রধান তিন দেবতার অন্যতম শিবকে বড়ই দূর্বল মনে হয়, আশ্চর্যের বিষয় হলো হিন্দুধর্মের মানুষেরা তার পূজা না করে, করেন তার লিঙ্গের পূজা করে পদ্মপুরাণ এ আছে ভৃগু নামক এক ঋষির অভিশাপের কারনে শিব পুরুষত্বহীন হন যার কারনে নাকি তার লিঙ্গের পূজা করা হয়। ব্রাহ্মণ পুরানের বর্ণনা অনুযায়ী, কয়েকজন ঋষির অভিশাপের কারনেই শিবের জীবনে এ বিড়ম্বনা হয়েছে। অন্যদিকে রামায়ণে দেখা

যায় হনুমান নামক বানর রামের চেয়েও বহুগুণ বেশি শক্তিশালী ছিল। রাবন সীতাকে অপহরণ করে কোথায় নিয়ে গিয়েছিল তা রামের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না বরং হনুমান ই তাকে সীতার অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করে। রামের লঙ্কায় পাড়ি দেবার ব্যবস্থা হনুমান ই করছিল এবং যুদ্ধে রাবণের হাত থেকে সীতাকে সেই উদ্ধার করেছিল। আরেক ঘটনায় পাওয়া যায় লক্ষ্মণ একবার বিষাক্ত তীরে আহত হলে তার নিরাময়ের জন্য একমাত্র উপায় ছিল হিমালয়ের ঔষধি পর্বতের উদ্ভিদ জাতীয় একটি গাছ। রামের পক্ষে তা আনা সম্ভব হয়নি, তিনি হনুমানের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে সে ঔষধি পর্বতে গেল কিন্তু উদ্ভিদ টি চিনতে পারলো না তখন হনুমান ই মাথার উপর তুলে পুরো পর্বত কে লঙ্কায় নিয়ে গিয়েছিল এরফলে নিজের শক্তির পরিচয় দেখিয়ে হনুমান নামক বানর টি দেবত্ব লাভ করেছিল। আরো অনেক উদাহরণ আছে দেবতাদের অক্ষমতার।

আঞ্চলিক দেবতা

হিন্দুধর্মে কিছু কিছু অঞ্চলভেদে বিশেষ বিশেষ দেবতার পূজা হয়। যেমন-

১, বাংলাদেশে সহ পুরো পশ্চিম ভারতে দুর্গাপূজা অত্যন্ত আড়ম্বের সাথে পালিত হয়।

২, অযোধ্যার দশরথের পুত্র রামচন্দ্রের পূজা উত্তর ভারতে অধিক হয়।

৩, দক্ষিন ভারতে রাবণের পূজা অধিক হয়।

৪, দক্ষিন-মধ্যভারতে, মহারাষ্ট্রে গণেশের পূজা হয় অধিক

শুধু যে অঞ্চলভেদে পূজা হয় তা নয় বরং গোত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার পূজা করা হয় এমনকি একই পরিবারে দু'ব্যক্তি দু'জন দেবতার পূজা করতে পারেন। হিন্দুধর্মের মতে তাদের দেবতাগণ অদৃশ্য নন।

দেবতাদের দৈহিক বৈচিত্র্য

দেবতাদের মধ্যে নানান দৈহিক বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত করা যায়। চন্দ্র আকারে যক্ষ্মার মতো, শুক্রাচার্য একচক্ষুবিশিষ্ট, গণেশ হস্তির মস্তকবিশিষ্ট, ইন্দ্র একশো যোনীবিশিষ্ট, অহল্যা পাথর সম কঠিন এবং জটসুর জটধারী, অনুরুপভাবে নারায়ণ গোলকার পাথরের মতো, ব্রহ্মা রক্ত রঙের চার চক্ষুবিশিষ্ট, মহাদেব রঙে সাদা ও চারমুখী, দূর্গা দশহাতবিশিষ্ট, জগন্নাথ বিকলাঙ্গ, গণপতির উদর স্ফীত, চমুন্ডের হাতে মাথা, কাল রঙে কালো এবং কৃষ্ণ শ্যামবর্ণ বিশিষ্ট। আরও উদ্ভুত বৈচিত্র্যময় দেবদেবী রয়েছেন।

দেবতাদের অবস্থান

বিশ্বনাথ কাশীতে, শ্রীকৃষ্ণ বৈকুন্ঠে ও কালীঘাটে, জগন্নাথ পুরীতে, গয়াসর গয়াতে, বাসুকি পাতালে, সর্পদেবতা নাগলোকে, বরুণ পানিতে, পবনদেবতা বায়ুতে, সীতা যোনী কামাখ্যায়, মহাদেব কলাগাছে, দূর্গা বটগাছে, কৃষ্ণ-ঠাকুর কদমগাছে এবং শিব পার্বতী বেলগাছে অবস্থান করেন। নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করায় এসব দেবতাকে বলা হয় স্থানীয় দেবতা।

রাগের দেবতা

-মহাদেব ভীষণভাবে রেগে দিয়ে একসময় তার শ্বশুর এর সারাটি দেহ প্রস্রাব করে দিয়েছিলেন। ভৃগু পা দিয়ে ভগবান এর বুকে আঘাত করেছিলেন। পরশুরাম পৃথিবীকে কুড়াল দিয়ে আঘাত করে ক্ষত্রিয়দের একুশবার বিতাড়ন করেছিলেন।

-গৌতম অহল্যাকে পাথরে রুপান্তরিত করেছিলেন। তিনি ইন্দ্রের দেহে এক হাজার যোনী সৃষ্টি করেছিলেন।

- চমুন্ড রেগে দেহ থেকে নিজের মাথাকে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন।

- জাহ্নমুনি গঙ্গার সব পানি পান করেছিলেন, এসব কাজ শুধুমাত্র ওনারা রেগেই করেছিলেন।

- শিব রেগে তার ছেলে গণেশের মাথা কেটে ফেলে এমনকি ভগবান ব্রহ্মার ৫ম মাথা কেটে ফেলে শিব শুধুমাত্র রেগে গিয়েই। একারণে সময়ে সময়ে ওনাদের রাগের দেবতাও বলা হয়ে থাকে।

প্রেমের দেবতা

কৃষ্ণ শুধুমাত্র রাধা, লক্ষ্মী, ও সরস্বতীর সঙ্গেই প্রেম করেন নি বরং তিনি এ ব্যতীত আরো এক হাজার গোপিনীর সাথে প্রেমে লিপ্ত ছিলেন। সতীর সাথে প্রেম করতে গিয়ে মহাদেব মাতাল হয়ে গিয়েছিলেন। গঙ্গার সাথে প্রেম করতে গিয়ে তিনি দূর্গার দ্বারা অভিশপ্ত হয়েছিলেন। অন্যদিকে হিমালয়ের কন্যা পার্বতীর সাথে প্রেম করতে গিয়ে দারুণভাবে নাজেহাল হয়েছিলেন। নারায়ণ তুলসির সাথে প্রেম করতে গিয়ে পাথরে রুপান্তরিত হয়েছিলেন। অহল্যার সাথে প্রেম করতে গিয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের দেহে এক হাজার যোনী (স্ত্রী জননেন্দ্রিয়) হয়েছিল। কয়েকজন ঋষির স্ত্রীর সাথে প্রেম করতে গিয়ে শিব তার নিজের লিঙ্গ হারায়। কৃষ্ণের প্রেমে আসক্ত হয়ে জগাই মাধাই পার্থিব বিষয়াদির প্রতি উদাসীন হয়ে পড়েছিলেন। হরি প্রেমে আসক্ত হয়ে নিমাই সংসারত্যাগী হয়েছিলেন। সর্বত্র প্রেম বিতরণের কাজ যারা করেন তারা হলেন : মেনকা, রতি এবং রম্ভ। প্রেমের রাজা ও রানীও আছে। রাজা হলে মদন এবং রানী হলেন রতি।

বিপদকালীন দেবতা

এমন কিছু দেবতা আছেন যাদের নিকট বিশেষ বিশেষ বিপদের সময় প্রার্থনা করা হয়, এদের মধ্যে রয়েছেন মনসা (সাপ দংশন করলে), জুরাসুর (জ্বর হলে), শীতলা (কলেরা ও বসন্ত দেখা দিলে), ইটে-কুমার (চুলকানি ও চর্মরোগ হলে) , দূর্গা যাকে যেকোনো বিপদের সময় ডাকা যায়, গণেশ (ব্যবসায়িক উন্নতির জন্য), কার্তিক (শত্রু থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য), এবং গঙ্গা (নৌকাডুবির ভয় হলে) । এরা হলেন ভয়কালীন দেবতা।

অস্ত্রধারী দেবতা

কোনো কোনো দেবতারা বিশেষ অস্ত্র ব্যবহার করে থাকেন। এরা হলেন মহাদেব(ত্রিশূল) , কৃষ্ণ (চক্র), বলরাম (লাঙ্গল), পরশুরাম (কুড়াল), রাম (তীর), নারায়ণ (শংখ, গদা, চক্র, পদ্ম) , কার্তিক (ধনুর্বাণ) , ইন্দ্র (বজ্র), দূর্গা(খড়গ), ভীম (গদা), মনসা(সাচ), এরা এবং আরো অনেকে এরকম অস্ত্রধারী দেবতা আছেন।

দেবতাদের বাহন

-শিবের বাহন নন্দীষাঁড় তাই ভক্তদের ষাঁড়ের ও পূজা করতে হয়।

- দেবী লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা পাখি।

- সরস্বতীর বাহন রাজহাঁস।

- দূর্গার বাহন সিংহ।

- বিষ্ণুর বাহন গরুড় পাখি

- কার্তিকের বাহন ময়ুর।

- গণেশের বাহন ইঁদুর

এরকম শক্তিশালী দেবতাদের বাহন গুলো ইঁদুর, ময়ুর, পেঁচা ইত্যাদি হতে পারে যা যুক্তি তে মেলে না

দেবতাদের বাহন পূজা

দেবতাগন পদব্রজে চলেন না। যদিও তাঁরা ইচ্ছে করলেই যেকোনো স্থানে যেকোনো সময় হাজির হতে পারেন। কল্পনা করলেই তাদেরকে পাওয়া যায়। যেহেতু তারা বাহনে চলেন এবং বাহন গুলো তাদের অতি পছন্দনীয়, তাই দেবতাদের বাহন পূজাও করা লাগে। বাহন ছাড়া নাকি সাধারণত দেবদেবীর আগমন ও নির্গমন হয় না। তাই তাদের পূজার সময় বাহনেরো ব্যবস্থা করতে হয়। এসবে ত্রুটি হলে দেবতাদের অসম্মান ও পাপ হয়।

শক্তিপূজা

মানুষ নিজের থেকে যাকে শক্তিশালী মনে করেন -সেরুপ শক্তির পূজা করেন। এটা প্রাকৃতিক শক্তি, প্রাণী শক্তি, এমন কি মানব শক্তি হলেও। রাজা-বাদশাহ, সেনাপতি হতে মানুষ পর্যন্ত আশ্রয় প্রার্থনা করে। আর্থিক ও সামাজিক উন্নতি কামনা করে । আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন পুরুষদেরকে দেবতার প্রতিমূর্তি হিসেবে কল্পনা করে তাদের পূজা করে, মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব, তার একটি বৈশিষ্ট্য হলো - নিজের থেকে শক্তিশালী ব্যক্তি বা শক্তির পূজা করে।

সনাতন ধর্মে দুই সমকামী দেবতা

সনাতন-হিন্দুদের প্রথম ধর্মীয় (শাস্ত্রীয়) গ্রন্থ হলো বেদ। চার বেদের মধ্য সর্বপ্রাচীন বেদটি হলো 'ঋগ্বেদ' । এটির রচনাকাল মোটামুটি ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। এই ঋগ্বেদে সাধারণত দেবতাদের প্রতিপত্তি দেখা যায়। এখানে বিভিন্ন দেবতাদের উদ্দেশ্য করে স্তুতি তথা গান (সাধারণ ভাষায় "মন্ত্র") রচিত হয়েছে। এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো যে, এই বেদে প্রধান দেবতা কিন্তু ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর নন ; বরঞ্চ এখানে আমরা প্রধান দেবতারূপে দেখতে পাই – ইন্দ্রকে, অতঃপর অগ্নি-বরুণ-সূর্য আদিকে।

ঋগ্বেদের ২ মণ্ডলের ২৭ সূক্তে ছয় জন আদিত্যের (দেবতা) নাম পাওয়া যায় – মিত্র, বরুণ, অর্যমা, ভগ, দক্ষ এবং অংশ। ঋষি কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে এদের জন্ম। এদের মধ্যে প্রথম দুজন দেবতা অর্থাৎ মিত্র ও বরুণ দেব হচ্ছেন আমাদের এই আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু। ঋগ্বেদে মিত্রকে বলা হয়েছে "দিনের প্রহরী ও সূর্যের সহযোগী দেবতা" । অন্যদিকে বরুণকে বলা হয়েছে "রাতের প্রহরী ও জল তথা সাগরের দেবতা " । দ্যুতিমান সূর্য হলো মিত্র ও বরুণ দেবের চক্ষুস্বরূপ।দেবতা হিসেবে ঋগ্বেদে মিত্র দেবের উল্লেখ প্রায় ক্ষেত্রেই বরুণ দেবের সঙ্গে সংযুক্ত। এমনকি অনেক জায়গায় দুজনকে একত্রে 'মিত্রবরুণ' বলে স্তুতি করা হয়েছে। দুজনের একত্র স্তুতি যেমন আছে, আবার স্বতন্ত্র বরুণ দেবের স্তুতিও অনেক রয়েছে।

কিন্তু ঋগ্বেদের মাত্র একটি সূক্তে (৩/৫৯) মিত্রদেবকে পৃথকভাবে স্তুতি করা হয়েছে। 'মিত্র' শব্দের অর্থ হচ্ছে বন্ধু। কিন্তু ঋগ্বেদে স্পষ্টরূপেই মিত্রকে বরুণের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলেই চিত্রিত করা হয়েছে। দুজনের মধ্যেই খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখানো হয়েছে ঋগ্বেদের বিভিন্ন সূক্তে। যা আমাদের আধুনিক পুরুষ-সমকামী ভাবনাকেই চিত্রিত করেছে অনেকাংশে। দুজনকে একে অন্যের সহযোগী রূপে ঘনিষ্ঠ-কার্য করতে দেখা যায়। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের দ্বিতীয় সূক্তে মিত্র-বরুণ যুগলের উল্লেখ পাওয়া যায় এভাবে –

"ঋতেন মিত্রাবরুণাবৃতাবৃধাবৃতস্পৃশা ক্রতুং

বৃহন্তমাশাথে।।"

সায়নাচার্য্যের ভাষ্যমতে –

"মিত্রবরুণৌ যুবাং ক্রতুং

প্রবর্তমানমিমং সোমযাগ"।

অর্থাৎ মিত্র এবং বরুণ নামক দুইজন যুবক (দেবতা), যারা সোমযাগ প্রবর্তন করে বা অনুষ্ঠান করে থাকে। বিভিন্ন টীকাকারগণের নির্দেশমর্মে আমাদের দেহের নিঃশ্বাসে বরুণদেব এবং প্রশ্বাসে মিত্রদেব অবস্থান করেন।

এ প্রসঙ্গে আমরা সবচাইতে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন দেখতে পাই 'শতপথ ব্রাহ্মণে'। এখানে মিত্র ও বরুণ দেবের মধ্যে সরাসরি দুজন পুরুষ-সমকামীর সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। এই 'শতপথ ব্রাহ্মণে'র একটি সূক্তে বলা হয়েছে যে বরুণ ও মিত্র দেব হলেন পরস্পর অর্ধচন্দ্র স্বরূপ। পূর্ণিমার রাতে এরা পরস্পর মিলিত হন এবং এক পূর্ণিমার রাতে বরুণ দেবের বীর্য মিত্র দেব ধারণ করেন ও দ্বিতীয় পূর্ণিমার রাতে মিত্র দেবের বীর্য বরুণ দেব ধারণ করেন (২.৪.৪.১৯ – 'শতপথ ব্রাহ্মণ')।

স্বর্গে দুজনের জন্য মিলনস্থানের ভবনটি সহস্র স্তম্ভের দ্বারা নির্মিত।

অন্যদিকে 'ভাগবত পুরাণে'ও বরুণ ও মিত্র দেবকে নিয়ে কিছুটা সমকামী সম্পর্ক দেখানো হয়েছে।

একবার বরুণ ও মিত্রদেবের রতিক্রিয়ার সময় তাদের বীর্য স্খলিত হয়ে সরোবরে পড়ে। সেই সরোবরে তখন স্বর্গের অপ্সরা উর্বশী জলক্রীড়া করছিলেন। অতঃপর বরুণ ও মিত্র দেবের স্খলিত বীর্য উর্বশী গ্রহণ করলে তা থেকে ঋষি অগ্যস্ত ও ঋষি বশিষ্ঠের জন্ম হয় (ভাগবত পুরাণ – ৬.১৮.৩)। আবার এ কাহিনীর কিছু অন্যরূপও দেখতে পাওয়া যায় –

অগ্যস্তশ্চ বশিষ্ঠশ্চ মিত্রাবরুণয়োর্ঋষী।

রেতঃ সিষিচতুঃ কুম্ভে উর্ব্বশ্যাঃ সন্নিধৌ দ্রুতম্।।

-(৬.১৮.৫ – 'শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ')

শ্রীধরস্বামী কৃত ভাগবত ভাষ্য মোটামুটি সর্বজনমান্য। তিনি এই শ্লোকের ভাষ্য বলেছেন – "অগ্যস্তশ্চ বলিষ্ঠশ্চ ঋষি মিত্রাবরুণয়োরভবতাম্। উভাবপি কুম্ভে রেতঃ সিষিচতুঃ।।" অর্থাৎ ঋষি অগ্যস্ত ও বশিষ্ঠ হলেন মিত্র ও বরুণের সন্তান, উভয়ে মিলিতভাবে কুম্ভে বীর্যস্খলন করেছেন।অর্থাৎ বরুণ ও মিত্র দেব অযোনি-রতিক্রিয়ার (Non-vaginal Sex)দ্বারা দুই পুত্র লাভ করতে সক্ষম হন। যা আধুনিক কালের পুরুষ-সমকামী দম্পতিদের সন্তান লাভের ক্ষেত্রে 'Surrogate Mother' এর প্রক্রিয়াকেই মনে করিয়ে দেয়।

এর থেকে সহজেই বোঝা যেতে পারে যে 'সমকামে'র ধারণা পাশ্চাত্য থেকে ভারতবর্ষে আসেনি।বরং ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ আগে থেকেই আমাদের ঋষি-মুনি তথা বেদকারদের ও পুরাণকারের মধ্যে 'সমকামে'র ধারণা যথেষ্টরূপেই ছিলো। যা খুব ভালো করেই তাদের সনাতন-সাহিত্যের মধ্যে ফুটে উঠেছে। আর তার চেয়েও বড়ো কথা এই 'সমকাম' (ভক্তির মোড়কে) তখন সমাজেও স্বীকৃত ছিলো (অন্তত হীন মনোভাব তো ছিলই না),তা না হলে বেদকার ও পুরাণকারেরা তাদের আরাধ্য দেবতাদের মধ্যে এমন সম্পর্ক দেখাতে সাহস করতেন না কখনোই।

তথ্যসূত্রঃ

১.ঋগ্বেদ- আনুমানিক রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০-১২০০ অব্দ

২.শতপথ ব্রাহ্মণ- রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব ৭০০ অব্দের কাছাকাছি কোনো সময়ে

৩.ভাগবত পুরাণ /শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ- এই পুরাণ প্রথমে মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। এর বর্তমান রূপটি খ্রিস্টীয় ৪র্থ থেকে ১০ম শতাব্দীর মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ে লিপিবদ্ধ হয়

কার্তিকের আশ্চর্য ও চমকপ্রদ জন্ম

যৌন সম্রাট মহাদেব শিব একদা স্বীয় স্ত্রী পার্বতীর সঙ্গে প্রবল রমণ ও রতিকর্মে লিপ্ত ছিলেন। শিবের তীব্র যৌনতায় পার্বতীর জীবন সংশয় দেখা দেয়। তবু মহাদেব শিব পার্বতী কে যৌনতা হতে অব্যাহতি দিচ্ছিল না। অগত্যা সেখানে পার্বতীর আহবানে তার প্রাণ রক্ষার্থে বিষ্ণু ও শ্রীকৃষ্ণ এর নির্দেশে দেবতাদের আবির্ভাব হয়। এসব দেখে মহাদেব দ্রুত গাত্রোত্থান করেন ফলে তাঁর বীর্যের ফোঁটা ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হয়। পৃথিবী এই শক্তিশালী বীর্য দেহে ধারণে অক্ষম হয়ে তা অগ্নির দিকে নিক্ষেপ করেন। অগ্নি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তা শরবনে নিক্ষেপ করে। শরবনে জন্ম হয় কার্তিকের। কার্তিক দেখতে এতই সুন্দর ছিল যে তাঁর সৌন্দর্য দেখে স্বীয় মাতা দূর্গাদেবীও কার্তিকের প্রতি আকর্ষণ সংবরণ করতে পারেন নি।

তৃতীয় অধ্যায়

অনেকে দেবতাদের ফেরেশতা বলে থাকেন, এটা বলা কতটুকু সমীচীন?

ফেরেশতা :

ফেরেশতা আল্লাহপাকের বিস্ময়কর সৃষ্টি। আল্লাহ তা'আলা নুর বা ঐশী জ্যোতি থেকে তাদের সৃষ্টি করেছেন। তারা আল্লাহর অতি সম্মানিত ও পুণ্যবান সৃষ্টি। তারা সবসময় আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকেন। পানাহার, বৈবাহিক ও জৈবিক চাহিদা থেকে তারা পুরোপুরি মুক্ত থাকেন। তারা পুরুষও নন, নারীও নন।

আল্লাহর হুকুমে ফেরেশতারা বিভিন্ন আকার ও রূপ ধারণ করতে পারেন। মানুষের মতো রক্ত-মাংসের সৃষ্টি না হওয়ায়, তাদের কামনা-বাসনা, পানাহারের প্রয়োজনীয়তা ও ঘুম-বিশ্রাম কিছুই নেই।

ফেরেশতা সৃষ্টির ব্যাপারে হাদিস শরিফে এসেছে, 'ফেরেশতাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, আল্লাহর নুর বা ঐশী আলো থেকে। ' (মুসলিম শরিফ, হাদিস নং : ২৯৯৬)

যেহেতু তাঁদের স্বাধীন চিন্তা নেই, সেহেতু তাঁরা আল্লাহকে কখনও অমান্য করেন না, অবাধ্যতাও তাঁদের প্রকৃতিতে নেই।

মহান আল্লাহ বলেন, '...তাঁরা (ফেরেশতারা) তা অমান্য করে না, যা আল্লাহ তাদের আদেশ করেন। তাঁরা যা করতে আদিষ্ট হয়, তা-ই করে। ' (সুরা : তাহরিম, আয়াত : ৬)

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, '...যারা তোমার প্রতিপালকের সামনে আছে, তাঁরা তো দিন ও রাতে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তাঁরা ক্লান্তি বোধ করে না। ' (সুরা হামিম সিজদা, আয়াত : ৩৮)

ভিন্ন ভিন্ন ফেরেশতাকে আল্লাহপাক ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য নিযুক্ত করেছেন। যেমন: জিবরাইল আলাইহিস সালাম কে নিযুক্ত করা হয়েছিল আল্লাহর আদেশে নবিদের কাছে বার্তা বহন করে আনার জন্য।

তাঁদের উপর ভিন্ন ভিন্ন কাজের দায়িত্ব থাকলেও, তাঁরা কিন্তু দেবতা বা ভগবান নয়। মুসলমানরা তাঁদের উপাসনা করে না । মুসলমানরা কেবলমাত্র পরম স্রষ্টা আল্লাহরই উপাসনা করে। সৃষ্টি কখনও সৃষ্টির উপাসনা করতে পারে না—সৃষ্টি স্রষ্টারই উপাসনা করে।

অপরদিকে, হিন্দুধর্মে ফেরেশতার কথা তো উল্লেখ ইই নেই, এমনকি দেবদূতের ধারণাও সেখানে অনুপস্থিত। হিন্দুরা কিছু অতি শক্তিশালী জীবের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন আর সেই শক্তিশালী সত্তাকে দেবতা হিসেবে পুজো করেন। (হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলিতে সর্বশক্তিমান স্রষ্টার কথা এবং একেশ্বরবাদের কথা থাকলেও বহু দেবতার অনুপ্রবেশে সেখানে কীভাবে ঘটল তা সহজেই অনুমান করা যায়। ইসলামধর্মে আছে, মিকাইল আ'লাইহিস সালাম ফেরেশতার উপর আছে বৃষ্টি বর্ষণের দায়িত্ব, আল্লাহর হুকুমে তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন । অন্যদিকে, হিন্দুধর্মে যিনি জলের দায়িত্বে আছেন, তিনি বরুন। তিনি সৃষ্টি না স্রষ্টা—তার ব্যাখ্যা কিন্তু সাধারণ হিন্দুদের কাছে নেই। হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলির মূলে যদি সর্বশক্তিমান এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরের কথা থাকে, বরুণের তাহলে কী পরিচয়? ঈশ্বর যদি সর্বশক্তিমান হন, তাহলে তেত্রিশ কোটি দেবতার কী প্রয়োজন ?

ফেরেশতারা অদৃশ্য ও পবিত্র, আল্লাহপাকের অনুগত কিন্তু দেবতাদের পবিত্র বলা হলেও তারা কিন্ত দৃশ্যমান মানুষের মতো জীবনযাপন করেছেন, কখনো কখনো ভগবান এর সাথে রাগারাগি করেছেন, কখনো কখনো তারা ভগবান এর মাথা কেটে ফেলেছেন, ভগবান এর বুকে পা দিয়ে আঘাত করেছেন, এক কথায় ভগবান এর অবাধ্য ও হতেন তারা, অশ্লীল কাজকর্ম করেছেন যা আগেই আমরা আলোচনা করে এসেছি। তাই আমরা বলতে পারি যে দেবতাদের ফেরেশতা বলা সমীচীন নয়।

দেবদেবীর কিছু অসারতার পর্যালোচনা

হিন্দুদের আকিদা:

মৃত্যু অর্থাৎ দেহত্যাগ। আত্মার মৃত্যু হয়না। ঈশ্বর যখন মানবরূপে জন্মেছেন তখনই তিনি মৃত্যুর জন্য বিধিবদ্ধ। আরেকটু প্রাঞ্জল করে বললে গীতা ভগবান বলছেন -

“যখন যখন ভারতে ধর্মের গ্লানি

আবির্ভূত হয়

অধর্মের অভ্যুত্থান ঘটে

তখন আমি আমাকে সৃজন করি

সাধু ব্যক্তির পরিত্রানার্থে এরং দুষ্কৃতীকারীদের বিনাশার্থে

ধর্ম স্থাপনার্থে আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই।”

তিনি যুগে যুগে নানা রুপে আবির্ভূত হন ধর্ম স্থাপন করেন ও ইহলোক ত্যাগ করেন আবার আসেন। ইহলোকে যেই আসে সেই মরনশীল। কারণ ইহলোক অনিত্য, মায়ামাত্র। এইজন্য তাঁর আগমন ও গমন ঘটে।

পর্যালোচনা : এখানে উনারা যে যুক্তি দিয়েছেন সবই মানলাম কিন্তু ধর্ম কে স্থাপন করার জন্য সৃষ্টিকর্তাকে পৃথিবীতে আসতে হয়েছে , কেন? সংসার করতে হয়েছে, স্ত্রী -সন্তান সবই ছিল কিন্তু কেন? পক্ষান্তরে আল্লাহপাক কোনো জাতিকে ধ্বংস করার ইচ্ছে করলে কখনো অনাবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়(আ'দ জাতিকে এভাবে ধ্বংস করা হয়,সুরা হুদ এ বর্ণিত আছে), একটি মাত্র বিকট আওয়াজ (সামুদ জাতির জন্য ধ্বংসের কারন ,সুরা নামল, সুরা হুদ-৬১ থেকে ৬৮), পুরো অঞ্চলের ভূমি উল্টিয়ে দেয়া (লূত জাতি,সুরা হুদে বর্ণিত আছে -৬৯-৮৩), নুড়িপাথর সহ ছোট্ট ছোট্ট আবাবিল পাখি দিয়ে বাদশাহ আবরাহা কে ধ্বংস করা হয়(সুরা :ফীল) বিশাল সমুদ্রে ফির'আউনসহ তাদের সঙ্গীদের ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে(সূরা কাসাস-৩৯-৪০),

আল্লাহপাক কে তো কখনো দুনিয়াতে আসায় লাগেনি এমনকি নবীদের ও এসব জালিম,পাপী সম্প্রদায়দের ধ্বংসের জন্য কিছু করেত হয়নি, স্বয়ং আল্লাহপাক শুধু হুকুম করেছিলেন যে হও ফলে তা হয়ে গেছে (সূরা ইয়াসিন-৮২), এভাবেই মহান আল্লাহ তাঁর অপার মহিমা, ক্ষমতায় সব করে থাকেন এজন্য তাঁকে পৃথিবীতে আসতে হয়নি।

এরপর আসি ধর্ম স্থাপন, তা কিন্তু এখনো স্থাপন হয়নি বরং ইসলামই একমাত্র ধর্ম যেটার জীবনব্যবস্থা পরিপূর্ণ করেছেন আল্লাহপাক এবং তার দ্বীনকে করেছেন পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত, তাই আর কোনো নবী-রাসুলদের আসতে হবেনা দ্বীনের কাজ করার জন্য , এরপর আসি, দুষ্কৃতিকারী বলতে যদি তারা অসুরদের, রাবণদের বুঝায় কিন্তু তাদের শাস্ত্র থেকে দেখা যায় অসুররাও ভগবান ব্রহ্মার আরাধ্য বা পূজা করে তাঁর থেকে বর লাভ করে, অসুররা তখন দেবতাদের উপর হামলা করে , বিপরীতে আবার ব্রহ্মা বিষ্ণুর কাছে যায়, বিষ্ণু শিবের কাছে যায়, কারন শিব নাকি ধ্বংসের দেবতা,, অথচ বলা হয় ব্রহ্মার ইই অংশ হলো অন্যান্য দেবতারা, শ্রীকৃষ্ণ, অন্যান্য সব অবতার, নিচের তথ্যটি পড়লে আরো পরিষ্কার হবে বিষয়টি,

ভাগবত পুরাণে বিষ্ণুকে (নারায়ণ) পরব্রহ্ম বলে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, তিনিই অসংখ্য বিশ্ব সৃষ্টি করে প্রতিটির মধ্যে ঈশ্বর-রূপে প্রবেশ করেন। বিষ্ণু রজোগুণ অবলম্বন করে ব্রহ্মা রূপে প্রত্যেক বিশ্বের মধ্যে চোদ্দোটি করে জগৎ সৃষ্টি করেন; সত্ত্বগুণ গ্রহণ করে বিষ্ণু রূপে সেই জগৎগুলি রক্ষা ও প্রতিপালন করেন এবং মহাকল্পের অন্তকালে তমোগুণ অবলম্বন করে ‘রুদ্র’ রূপে সেই জগৎগুলি ধ্বংস করেন।

এই পুরাণ প্রথমে মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। এর বর্তমান রূপটি খ্রিস্টীয় ৪র্থ থেকে ১০ম শতাব্দীর মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ে লিপিবদ্ধ হয়। ভাগবত পুরাণের পাণ্ডুলিপিগুলি আঠার শতকের মধ্যে সংশোধিত অসংখ্য অসামঞ্জস্যপূর্ণ সংস্করণে টিকে আছে ও বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা জুড়ে অসংখ্য বার সংশোধিত হয়েছে। পক্ষান্তরে মুসলমানদের একমাত্র ধর্মগ্রন্থ আল-কুরান যেটি সেই ১৪শ বছর আগে যেমন নাযিল

হয়েছে ঠিক তেমনি আছে কোনো পরিবর্তন হয়নি,আয়াত ত দূরে থাক এমনকি একটা সুক্ষ্ম যবর, যের, পেশ, হরকত, যজম ও কোথাও কেউ পরিবর্তন দেখাতে পারবেনা, আর এই কিতাব এমন এক কিতাব যার মধ্যে বিন্দুমাত্র কোনো সন্দেহ নেই (সুরা বাকারা -২)।

তাহলে দেখেন একই সময় এক ভগবান আরেক ভগবান এর কাছে সাহায্য চাচ্ছে, আবার বিষ্ণু কে কখনো ধ্বংসের কাজ, কখনো লালন পালন এর কাজ

কখনো শিবকে দেবতা আবার অন্যদিকে ধ্বংসকর্তা বলা হয়, তো একজন সৃষ্টিকর্তার কেন দেবতাদের উপর নির্ভর করা লাগবে কেনই বা নিজের ধ্বংস করার গুণ থাকা সত্ত্বেও আরেক দেবতারুপে অংশ হয়ে ধ্বংসের কাজ করতে হবে, অন্যভাবে বুঝা যায় যে ভগবান নিজেরই গুন থাকছে কিন্তু তাঁর দূর্বলতা, নির্ভরশীলতা দেবতাদের উপর পড়ে, যারা কিনা কখনো কখনো প্রচন্ড রাগী, সমকামীতার মতো জঘন্য অপরাধ, নারীদের ধর্ষণ ইত্যাদি কাজে লিপ্ত ছিল যা আমরা আগেই আলোচনা করে এসেছি, তাদের শাস্ত্র গুলো পড়লে এরকমই কিছু অবাক করা বিষয় আপনি পাবেন। যা একজন প্রকৃত প্রভুর বৈশিষ্ট্য এর বহির্ভূত।

অথচ মুসলমানদের সৃষ্টিকর্তা একজন তিনি হলেন আল্লহ, যাঁর সমন্ধে তিনি নিজেই পবিত্র কুরআন এ- সুরা ইখলাস -এ বলেছেন :

قُلۡ ہُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ

-বলুন, তিনি আল্লাহ, এক।-১

اَللّٰہُ الصَّمَدُ

-‘আল্লাহ্ কারও মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। -২

لَمۡ یَلِدۡ ۬ۙ وَ لَمۡ یُوۡلَدۡ

‘তিনি কাউকেও জন্ম দেন নাই এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয় নাই।-৩

وَ لَمۡ یَکُنۡ لَّہٗ کُفُوًا اَحَدٌ

এবং তাঁর সমকক্ষ নয় কেউ। -৪

অর্থাৎ আল্লাহপাক কারো উপর নির্ভরশীল নন, বরং সকলেই তাঁর উপর নির্ভরশীল, তাঁর কোনো স্ত্রী, সন্তান কিছুই নেই আর এসবের তাঁর প্রয়োজন ও নেই, এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই সুবহানাল্লাহ, কত সুন্দর কথা।

চতুর্থ অধ্যায়

সাধারণ কিছু প্রশ্ন-উত্তর পর্ব

প্রশ্ন নং -১

দেব-দেবীর সংখ্যা ৩৩ কোটি নাকি ৩৩ প্রকার?

উত্তর : অথর্ব বেদে ১০ অধ্যায় এ ৩৩ প্রকার এর কথা বলা হয়েছে

- তারা হলেন : একাদশ রুদ্র-১১
- দ্বাদশ আদিত্য -১২
- অষ্টবসু -৮
- অশ্বিনী কুমারদ্বয়-২

রেফা-বৃহদারন্যক উপনিষদে

প্রশ্ন নং -২

দেব-দেবীর ক্ষমতা অনেক সময় অসুর,ঋষিগণদের থেকেও দূর্বল ছিল, কথাটা কতটুকু সত্য?

উত্তর :

- জি কথাটি সত্য কারন - হিন্দুদের অনেক কাহিনিশাস্ত্রে দেখা যায় দেবতা ও অসুরদের মধ্যে যুদ্ধে অসুররা জয়ী হতো ।

- শিব নামক ধ্বংসের দেবতা পুরুষত্বহীন হন অনেক ঋষিদের অভিশাপে- রেফারেন্স- পদ্মপূরাণ
- হনুমান নামক বানর রামের থেকেও শক্তিশালী ছিল জানা যায় তাদের রামায়ণ শাস্ত্রে,কারন লংকার যুদ্ধে হনুমান সীতার অবস্থান নির্নয়, উদ্ধার করেছিল সেখানে রাম কিছুই করতে পারেনি

প্রশ্ন নং -৩

দেবতাদের কি রাগ ছিল?

উত্তর - জি হ্যাঁ কারন তাদের শাস্ত্র থেকে জানা যায় ভৃন্ড নামক দেবতা রাগে ভগবানের বুকে আঘাত করেছিলেন, শিব রাগে তার ছেলে গনেশের মাথা কেটে ফেলে।

প্রশ্ন নং-৪

কখনো কখনো দেবতারাও স্রষ্টার উপর প্রবল হতেন?

উত্তর - জি হ্যাঁ কারন অনেক কাহিনি শাস্ত্রে দেখা যায় কোনো এক সময় শিব ও ব্রহ্মা বিতর্ক চলাকালে শিব দেবতা হয়েও ব্রহ্মার ৫ম মাথা কেটে ফেলে।

প্রশ্ন নং -৫

দেবতাদের অনেকে পরকীয়া করত -কথাটা কতটুকু সত্য?

উত্তর - তথ্যটি সত্য কারন শিব নামক দেবতা একজন ঋষির স্ত্রীর সাথে প্রেম করতে গিয়ে লিঙ্গ হারিয়ে ফেলেন।

প্রশ্ন নং-৬

অসুরের সাথে যুদ্ধের জন্য শক্তির দেবতা পুরুষ হওয়ার কথা ছিল কিন্তু তা না হয়ে নারী অর্থাৎ দেবী হলো কেন?

উত্তর - কারন অসুর ব্রহ্মা থেকে বর লাভ করেছিল তাকে কোনো দেবতা, প্রানীকুল, মানুষ হত্যা করতে পারবেনা।

তাহলে প্রশ্ন হলো দেবীরা ত নারী রুপী আর নারী রা ত মানুষ বা প্রানীরই মধ্যে, এক্ষেত্রে কেমন যেন অসামঞ্জস্যতা থেকে গেল না?

প্রশ্ন নং -৭

অসুররা কি স্বর্গেও হামলা করতে পারতো?

উত্তর- জি হ্যাঁ কারন আমরা অনেক কাহিনি শাস্ত্রে দেখতে পাই অসুররা মাঝে মাঝেই স্বর্গে হামলা করতো, এই ভয়ে দেবতারা ব্রহ্মা, বিষ্ণুর শরনাপন্ন হতো, তাদেরকে দমন করার জন্য আবার দেবী সৃষ্টি হতো যেমন - দূর্গা, কালি ইত্যাদি দেবী।

প্রশ্ন নং -৮

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ভগবান হয়েও অসুরদের হামলায় স্বর্গহারা হতো?

উত্তর- জি বিষয় টা অবাক হলেও এটা তাদের কাহিনি শাস্ত্রে জানা যায় যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ভগবান হয়েও অসুরদের হামলায় স্বর্গহারা হতো আবার ভগবান হয়েও শিব নামক দেবতার শরনাপন্ন হতো।

প্রশ্ন নং-৯

শিব ও কালী দেব-দেবী ছিলো কিন্তু তাদের কন্যাদ্বয় দেবী লক্ষীর স্বামী ভগবান বিষনুর সংগে বিয়ে হয়, অপরদিকে স্বরসতীর বিয়ে হয় ভগবান ব্রহ্মার সংগে,, দেবী হয়েও ভগবান এর স্ত্রী হয় কীভাবে? আবার দেখা যায় শিব সেই হিসেবে শ্বশুড়ের ব্রহ্মার মাথা কেটে ফেলে কিভাবে?

উত্তর : এখানে হিন্দধর্মের স্পষ্ট অসারতা বুঝা যাচ্ছে।

প্রশ্ন নং -১০

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব যদি একই সত্ত্বা হয় তাহলে তিনজনের স্ত্রী ত সবার স্ত্রী, আবার একজন এর সন্তান সবার সন্তান হওয়ার কথা, এভাবে বুঝা যাচ্ছে কখনো স্ত্রী সন্তান হিসেবে আবার সন্তান স্ত্রী হিসেবে হচ্ছে, কীভাবে?

উত্তর : হিন্দু ধর্মের অনুসারী রা বলে থাকে যে তারা একেক যুগে একেক অবতার হিসেবে এসেছেন।

হিন্দু ভাই-বোনদের সাথে কথোপকথন এর মাধ্যমে দাওয়াত দেয়ার পদ্ধতি:

কথোপকথন -১

ফাতিমা: আসসালামু আ'লা মানিত্তাবাউল হুদা

মৌমিতা: ওয়ালাইকুমুসসালাম/ আদাব / নমস্কার,,, কেমন আছিস দিদি?

ফাতিমা : আলহামদুলিল্লাহ ভালো,, আচ্ছা একটা প্রশ্ন করি?বল দেখি তোদের দেবতাদের সংখ্যা কত?

মৌমিতা: কেন আমরা ত ছোট বেলা থেকে শুনে আসছি, আমাদের ধর্মে ৩৩ কোটি দেবতা।

ফাতিমা : কি যে বলিস দিদি, তোর ধর্মগ্রন্থ তুই কি আসলেই পড়িস? আমি ত সেদিন জানলাম তোদের অথর্ববেদে ১০ অধ্যায় এ ৩৩ প্রকার এর কথা বলা হয়েছে,, আর তারা হলেন একাদশ রুদ্র-১১,দ্বাদশ আদিত্য-১২ অষ্টবসু -৮,অশ্বিনী কুমারদ্বয়-২,,,আর রেফা যদি জানতে চাস সেটাও দেখলাম -বৃহদারণ্যক উপনিষদে,,, ঠিকভাবে নিজের ধর্ম টাকে স্টাডি করা উচিত বান্ধবী, তাহলে অনেক বিষয় ক্লিয়ার ধারণা পাওয়া যাবে, আর আমি শুনেছি তোরা শুনে শুনেই অনেক ধর্মের কথা বলিস কিন্তু নিজেদের আসল গ্রন্থ বেদ, উপনিষদ গুলো এতো পড়া হয়না তোদের কিন্তু আমাদের ধর্মগ্রন্থ একটাই, আল-কুরান, যেটা আমরা ছোট বেলা থেকেই পড়ে আসি, অন্তত ইসলামের মৌলিক বিষয় গুলো আমাদের জানা লাগে, নিজের ধর্ম স্টাডি না করলে বুঝবো কিভাবে এটা আদৌ সঠিক কিনা?

মৌমিতা: হুম্মম, তুই ঠিকই বলেছিস এসব বিষয় নিয়ে আমার স্টাডি করা উচিত, আমরা ত অনেক কিছুই ভুলভাল জানি।

কথোপকথন -২

যায়নাব**:** আসসালামু আ'লা মানিত্তাবাউল হুদা।

মিতালী**:** আদাব,কেমন আছিস দিদি?

যায়নাব: আল্লাহপাক অধিক ভাল রাখছেন,, আচ্ছা তুই এসেছিস ভালই হইছে, আচ্ছা সেদিন শুনলাম তোদের দেব-দেবীর ক্ষমতা নাকি অসুর মানে যাকে তোরা খারাপ শয়তান বলিস আবার ঋষিগণ দের থেকেও নাকি দেব-দেবীরা দূর্বল?

মিতালী: কোথায় শুনলি?

যায়নাব **:** কেনো তোদের কাহিনি শাস্ত্রে আছে, দেখিস দেবতারা হেরে যেত অসুরদের সাথে অনেক যুদ্ধে, রামায়ণ পড়িস, আবার এ আছে শিব যে তোদের দেবতা যাদের তোরা খুব ভক্তি করে পূজা করিস তিনি নাকি পুরুষত্বহীন হউন বিভিন্ন ঋষিদের অভিশাপেই, আবার হনুমান একটা বানর হয়েও সীতার খোজ দেয়, উদ্ধার করে লংকার যুদ্ধে, সেখানে রাম তোদের কত বড় দেবতা কিন্তু সেও এসব করতে পারেনি,

মিতালী: হুম্মম তোদেরো ত নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধে হেরেছিলেন, তাইনা.?

যায়নাব **:** ব্যাপার টা হারজিত বিষয় না, বিষয় হলো আমরা ত নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে মানুষ ও আল্লাহপাক এর একজন রসুল ব্যতিত অন্যকিছু বলিনা, তো একজন মানুষ হিসেবে এরকম ভুল ত হবে কারন সব ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহপাক, মানুষ তখনি সব করতে পারে যখন যেটা আল্লাহপাক চায়,, কিন্তু তোরা ত দেবতাদের মানুষ বলিস না, তাদের ভগবান মানে সৃষ্টিকর্তার মতোই পূজাও করিস সেখানে আমরা কিন্তু কোনো মানুষ কেনো কোনো ফেরেশতাদেরো এরকম ইবাদাত করিনা

মিতালী: হুম বিষয়টি নিয়ে ভাববো।

কথোপকথন -৩

মুহাম্মাদ **:** আসসালামু মানিত্তাবাউল হুদা দাদা?

শিবু **:** নমস্কার দাদা,ভাল আছেন?

মুহাম্মাদ **:** আলহামদুলিল্লাহ ভালো রে, আচ্ছা একটা প্রশ্ন করি? তোদের ভৃন্ড নামক যে দেবতা তিনি নাকি এমন রাগে গিয়েছিলেন যে রাগে ভগবান এর বুকে আঘাত করেছিলেন, আবার শিব নামক দেবতা নাকি উনার ছেলে গনেশের মাথা কেটে ফেলে দেন শুধু রাগের কারনেই,,তোরা যাদের ভক্তি-পূজা করিস এনারা কিভাবে এরকম রাগওয়ালা দেবতা হতে পারে, আর একটা জিনিস দেখ দেবতা হয়ে আবার ভগবান যে দেবতার উপরে তার বুকে আঘাত করেছিলেন, ইনফরমেশন টা শুনেই অবাক লাগছে, এটা কিভাবে সম্ভব?

শিবু : হুম্মম বিষয় টা নিয়ে আমিও কখনো ভাবিনি, সত্যিই ত ভগবান এর উপর দেবতাদের এরকম আচরণ কিভাবে হয়?

কথোপকথন -৪

সাদ : আসসালামু মানিত্তাবাউল হুদা

গৌতম : আদাব দাদা, কি খবর পরে?

সাদ: আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহপাক অলটাইম ভাল খবরের মধ্যে রেখেছেন, একটা প্রশ্ন ছিল? করতে পারি

গৌতম : জি অবশ্যই

সাদ: সেদিন শুনলাম তোদের কাহিনি শাস্ত্রে আছে যে দেবতারা কখনো কখনো ভগবান এর উপর প্রবল হতো

গৌতম **:** কিভাবে দাদা?

সাদ: আমি পড়লাম যে শিব যে দেবতা তিনি নাকি একটা বিতর্ককালে ব্রহ্মার ৫ম মাথা কেটে ফেলে, যেখানে তোরা বলিস যে দেবতারা আমাদের ফেরেশতাদের মতো, সেখানে দেবতা কিভাবে ভগবান একজন সৃষ্টিকর্তার সাথে তর্ক করতে পারে আবার এই ক্ষমতা কিভাবে রাখেন যে তিনি ভগবান এর মাথা কেটে ফেলতে পারেন, হাউ ইজ ইট পসিবল?

গৌতম : হুম্মম এভাবে ভাবিনি কখনো রে।

কথোপকথন -৫

মুয়াজ: আসসালামু মানিত্তাবাউল হুদা

দেব : আদাব দাদা,, ভাল আছেন?

মুয়াজ: আলহামদুলিল্লাহ, আচ্ছা দেব একটা প্রশ্ন করি তোমাকে, শিব নামক দেবতা নাকি ঋষির স্ত্রীর সাথে পরকিয়া করেছিলেন, যার কারনে অই ঋষি উনার লিংগ কেটে দেয়, একজন দেবতাদের তোমরা পূজার আসনে বসাও সেখানে তিনি এরকম খারাপ গর্হিত কাজ কিভাবে করতে পারেন, আমার মাথায় আসছেনা,

দেব : আসলে আমাদের ধর্মে এরকম শুনা যায় যা আসলেই বিশ্বাসযোগ্য নয়, বিষয় গুলো ভেবে দেখব আমি।

কথোপকথন - ৬

আব্দুল্লাহ: আসসালামু মানিত্তাবাউল হুদা, দাদা কেমন আছেন?

গণেশ: ভগবান এর কৃপায় আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি?

আব্দুল্লাহ: আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহপাক খুব ভাল রাখছেন, দাদা একটা প্রশ্ন করার ছিল, আপনাদের কাহিনি শাস্ত্রে আছে অসুরের সাথে যুদ্ধ করার জন্য শক্তির দেবতা পুরুষ হওয়ার কথা ছিল কিন্তু নারীরুপী দেবী হলো কেনো?

গণেশ: কারন আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছিল যে অসুর ব্রহ্মা থেকে বর লাভ করেছিল যে তাকে কোনো দেবতা, প্রানীকুল, মানুষ হত্যা করেত পারবেনা।

আব্দুল্লাহ : তাহলে প্রশ্ন হলো দেবীরা ত নারী রুপী আর নারী ত মানুষ বা বলা যায় প্রানীর মতোই, আর প্রান না থাকলে ত জড়পদার্থ হতো, জড় পদার্থ ত কোনো কিছু সক্ষম নয়, বিষয় গুলো সাংঘর্ষিক হয়ে গেলো না বিজ্ঞানের সাথে

গণেশ : হুম্ম এখন ত তাই মনে হচ্ছে।

কথোপকথন -৭

আবু বকর : আসসালামু মানিত্তাবাউল হুদা, কেমন আছেন দাদা?

রহিত : নমস্কার, আপনি?

আবু বকর : আলহামদুলিল্লাহ ভালো, একটা প্রশ্ন ছিল দাদা, আচ্ছা বলেন তো অসুররা ভগবান মানে আপনাদের সৃষ্টিকর্তা থাকা সত্ত্বেও স্বর্গে কিভাবে হামলা করে যেটা ভগবান এর ক্ষমতার উর্ধ্বে চলে যাচ্ছে, আর আমাদের জান্নাতে ত শয়তান কেন কোনো নবী,ফেরেশতা এনারাও কোনো ক্ষমতা রাখেনা জান্নাতের চুল পরিমাণ ক্ষতি করার, আবার এই হামলা থেকে মুক্তি পাবার আশায় সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, পালনকর্তা বিষ্ণু পর্যন্ত তাদেরই বানানো দেবী দূর্গার কাছে ফরিয়াদ জানায়, হাউ ইজ ইট পসিবল?

রহিত : প্রশ্নটা জটিল, স্টাডি করতে হবে।

কথোপকথন- ৮

ওমর ফারুক : আসসালামু মানিত্তাবাউল হুদা, কেমন আছেন দাদা?

অর্ক: ভগবান এর কৃপায় ভাল, আপনি?

ওমর ফারুক : আলহামদুলিল্লাহ ভালো রে দোস্ত, দোস্ত একটা প্রশ্ন করি? তোদের ভগবান রা অসুরদের হামলায় কিভাবে ভগবান হয়েও স্বর্গহারা হতো? আবার এদের থেকে পরিত্রানের জন্য শিব নামক দেবতার শরনাপন্ন হতো? অথচ আমাদের ধর্মে জীন নামক ইবলিশ শয়তান একটা কথা শুধু শুনেনি আল্লাহর যেটা ছিল অবাধ্যতার চরম পর্যায় সেটার জন্য শয়তান কে বের করে দিয়েছিল জান্নাত থেকে আর কখনো সে ঢুকতে পাবে না, এটা তার ক্ষমতা নেই।

অর্ক: তোদের এটা কেমন কথা একটার জন্য এতো বড় শাস্তি শয়তান পাবে?

ওমর ফারুক : উহু বিষয় টা শুধু ওইটুকুই না শয়তান পরে আর কখনো তওবা করেনি, উপরন্তু সে আরো বেশি অবাধ্য হয়ে মানুষকে জাহান্নামের পথে নিয়ে যাওয়ার শপথ করে, আর সে বদ্ধপরিকর যে আর তওবা করবে না, এজন্য এই শাস্তি, নচেত আমাদের বলা হয়েছে যে বান্দা যখনি আল্লাহপাক এর কাছে ভুলের জন্য মাফ চাবে তখনি আল্লাহপাক মাফ করে দিবেন আলহামদুলিল্লাহ, শুধু মানুষ না জ্বীনের ক্ষেত্রেও তাই।

অর্ক: আসলেই আমি বিষয় টা মিলাতে পারি না ভগবান এর ক্ষমতা গুলো কেন এরকম অসামঞ্জস্য, স্টাডি করতে হবে।

কথোপকথন -৯

আহমাদ: আসসালামু মানিত্তাবাউল হুদা

নিত্য: নমস্কার, ভাল?

আহমাদ: আলহামদুলিল্লাহ ভালো রে, একটা প্রশ্ন করি? শিব ও কালী নাকি দেবী ছিল, কিন্তু তাদের মেয়ে লক্ষ্মীর সাথে ভগবান পালনকর্তা বিষ্ণুর সাথে কিভাবে বিয়ে হতে পারে, আবার সরস্বতীর সাথে বিয়ে হয় ভগবান ব্রহ্মার সাথে, দেবী হয়েও ভগবান এর সাথে বিয়ে হয়? একজন সৃষ্টিকর্তা হয়েও তার সৃষ্টি দেবীর সাথে বিয়ে করতে পারে? আবার শিব দেখা যায় শ্বশুড় ব্রহ্মার মাথা কেটে ফেলে, এগুলো কি আদৌ বিশ্বাস করার মতো?

নিত্য: ধর্মে ত এটাই বলা আছে ভাবতে হবে, মিলানো আসলে টাফ, আমি নিজেও ভাল করে বলতে পারবো না।

কথোপকথন -১০

মুস্তফা : আসসালামু মানিত্তাবাউল হুদা, কেমন আছেন দাদা?

রামদেব: নমস্কার দাদা, ভাল?

মুস্তফা : জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো, একটা প্রশ্ন মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে, আচ্ছা তোদের ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব যদি একই সত্ত্বা হয় তাহলে ৩ জনের সন্তান ত সবারই সন্তান, অন্যদিকে একজনের স্ত্রী সবার স্ত্রী, কখনো স্ত্রী সন্তান হচ্ছে, সন্তান স্ত্রী হচ্ছে, কারন শিবের মেয়েরা ত ভগবান এর সাথে বিয়ে হইছে আবার বলা হয় তারা একই সত্ত্বা, এগুলো কিভাবে?

রামদেব : এনারা একেক যুগে একেকভাবে এরকম আসছেন এজন্য এরকম হইছে?

মুস্তফা : তাই বলে ভগবান এর এতো সৃষ্টির অভাব হলো কখনো স্ত্রী সন্তান হবে, সন্তান স্ত্রী হবে?

রামদেব:হুম্মম।

রেফারেন্স

- আল কুরআন
- হিন্দু ভাইদের দাওয়াত দেয়ার পথ ও পদ্ধতি -মুফতি যুবায়ের আহমদ হাফিজাহুল্লাহ
- মাসিক আলোর পথে - ইসলামিক ম্যাগাজিন
- দাওয়াত দেয়ার পথ ও পদ্ধতি -ড. খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যার এর লেখা
- Stella Kramrisch (1994), The Presence of Siva, Princeton University Press, আইএসবিএন ৯৭৮-০৬৯১০১৯৩০৭, pages 338-339
- Hajime Nakamura (1998), A Comparative History of Ideas, Motilal Banarsidass, আইএসবিএন ৯৭৮-৮১২০৮১০০৪৪, pages 26-33
- David Kinsley (2005), Hindu Goddesses: Vision of the Divine Feminine in the Hindu Religious Traditions, University of California Press, আইএসবিএন ৯৭৮-৮১২০৮০৩৯৪৭, pages 6-17, 55-64।
- Bina Gupta (2011), An Introduction to Indian Philosophy, Routledge, আইএসবিএন ৯৭৮-০৪১৫৮০০০৩৭, pages 21-25
- David Kinsley (2005), Hindu Goddesses: Vision of the Divine Feminine in the Hindu Religious Traditions, University of California Press, আইএসবিএন ৯৭৮-৮১২০৮০৩৯৪৭, pages 18, 19

- George Williams (2008), A Handbook of Hindu Mythology, Oxford University Press, আইএসবিএন ৯৭৮-০১৯৫৩৩২৬১২, pages 24-33
- "Botany of Haoma", from *Encyclopædia Iranica*. Accessed 15 June 2012
- Renou, Louis. *L'Inde Classique*, vol. 1, p. 328, Librairie d'Ameriqe et d'Orient. Paris 1947, reprinted 1985. আইএসবিএন ২-৭২০০-১০৩৫-৯.
- Knut Jacobsen (2008), Theory and Practice of Yoga : 'Essays in Honour of Gerald James Larson, Motilal Banarsidass, আইএসবিএন ৯৭৮-৮১২০৮৩২৩২৯, pages 77-78
- Radhakrishnan and Moore (1967, Reprinted 1989), A Source Book in Indian Philosophy, Princeton University Press, আইএসবিএন ৯৭৮-০৬৯১০১৯৫৮১, pages 37-39, 401-403, 498-503
- Mircea Eliade (2009), Yoga: Immortality and Freedom, Princeton University Press, আইএসবিএন ৯৭৮-০৬৯১১৪২০৩৬, pages 73-76
- Nicholas Gier (2000), Spiritual Titanism: Indian, Chinese, and Western Perspectives, State University of New York Press, আইএসবিএন ৯৭৮-০৭৯১৪৪৫২৮০, pages 59-76
- Jeaneane D Fowler (2012), The Bhagavad Gita, Sussex Academic Press, আইএসবিএন ৯৭৮-১৮৪৫১৯৩৪৬১, pages 253-262,
- Renou 1964, পৃ. 55

- **Mike Burley** (2012), Classical Samkhya and Yoga - An Indian Metaphysics of Experience, Routledge, আইএসবিএন ৯৭৮-০৪১৫৬৪৮৮৭৫, page 39-41;
- **Lloyd Pflueger**, Person Purity and Power in Yogasutra, in Theory and Practice of Yoga (Editor: Knut Jacobsen), Motilal Banarsidass, আইএসবিএন ৯৭৮-৮১২০৮৩২৩২৯, pages 38-39;
- **Kovoor T. Behanan** (2002), Yoga: Its Scientific Basis, Dover, আইএসবিএন ৯৭৮-০৪৮৬৪১৭৯২৯, pages 56-58
- Basel, Peter Charles। "The Samkhya system of the Bhagavata Purana"।

- Basel, Peter Charles। "The Samkhya system of the Bhagavata Purana"।

- *Chauviac, Ludo*। Benezit Dictionary of Artists। Oxford University Press। ২০১১-১০-৩১।